কালিদাসের
শকুন্তলা

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
ছাব্বিশে জানুয়ারী
১৯৫৯

॥ প্রকাশক ॥
চিরায়ত সাহিত্যের পক্ষে
শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত
১৬ এস, ডোভার লেন
কলিকাতা—২৯

॥ চিত্র-সম্পাদনা ও চিত্র-পরিচিতি ॥
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
অধ্যক্ষ, আশুতোষ সংগ্রহশালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

॥ বৈয়াকরণ ও ভাষাবিদ্ ॥
শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ

॥ মুদ্রক ॥
শ্রীমুরারিমোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা—১৪

॥ প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ॥
শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ

॥ প্রচ্ছদ-ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণ ॥
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং
২১৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

॥ গ্রন্থন ॥
মহম্মদ মোসলেম খান ব্রাদার্স
১৬৬, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

দাম : পাঁচ টাকা পঁচাত্তর ন. প.

মহাকবির অমর স্মৃতির উদ্দেশে

অনুবাদ সম্পর্কে

শ্রীরাজশেখর বসু (পরশুরাম)

৪/১/৫৭

শ্রীযুক্ত শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত সাহিত্যিক মহলে 'অনুবাদী' নামে খ্যাত। তিনি বাঙলা গদ্যে শকুন্তলার একটি সরল আক্ষরিক অনুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কালিদাসের শকুন্তলা ভারতীয় কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ চিরায়ত (classic) গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় না হলে সাহিত্য চর্চা অসম্পূর্ণ থাকে। আশা করি শ্রীযুক্ত শত্রুজিতের চেষ্টা সফল হবে এবং তাঁর অনুবাদ বহু পাঠককে আনন্দিত করবে।

রাজশেখর বসু

মহাকবি কালিদাসের মূল বই "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" সম্পর্কে জার্মান মহাকবি গ্যেটে, শীলার ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

গ্যেটে

"কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।"

(গ্যেটের মন্তব্যের রবীন্দ্রনাথ কৃত ভাবানুবাদ)

শীলার

"শকুন্তলার সঙ্গে দূরতম তুলনা হতে পারে এমন কোন সুন্দর নারীত্ব কি মধুর প্রেমের সৌন্দর্যের চিত্র সমগ্র প্রাচীন গ্রীসে কোন কাব্যে নেই।"

(হমবোল্টের কাছে লেখা শীলারের চিঠি)

রবীন্দ্রনাথ

"শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্সপিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।"

(প্রাচীন সাহিত্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ)

সূচীপত্র

চিত্রাবলী

প্রকাশকের নিবেদন

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর সরল বাংলা গদ্য অনুবাদ 'কালিদাসের শকুন্তলা' চিরায়ত সাহিত্যের প্রকাশিত প্রথম বই। প্রাচীন ও আধুনিককালের চিরায়তধর্মী সাহিত্য, শিল্পকলা ও অন্যান্য বিষয়ের মৌলিক বই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিয়মিত পরিবেশন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের পরবর্তী বই 'শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক' বর্তমানে যন্ত্রস্থ।

'কালিদাসের শকুন্তলা'র অনুবাদক শক্রজিৎ দাশগুপ্ত সাহিত্যিক মহলে 'সত্যবক্তি' নামে পরিচিত। তিনি খ্যাতিমান বাংলা গদ্য লেখক। গত কয়েক বছর ধরে তিনি মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত থেকে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এর আক্ষরিক, বিশুদ্ধ ও সরল বাংলা অনুবাদের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বারংবার তা নিয়ে আলোচনা ও সংশোধন করেছেন। অনুবাদক অত্যন্ত কর্মব্যস্ত চিকিৎসক তারই মধ্যে তিনি অনুবাদের এ কাজ খুবই যত্ন, দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। শ্রমসাধ্য এ কাজে তাঁর সহকর্মী ছিলেন শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। আক্ষরিক সরল গদ্য অনুবাদে তাঁরা মূল বইয়ের ভাব ও রস যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। কি পদ্ধতিতে অনুবাদ করা হয়েছে তা অনুবাদকের ভূমিকায় বলা হয়েছে।

চলতি দুর্মূল্যতার বাজারে 'চিরায়তসাহিত্য' যথাসাধ্য দায়িত্ব নিয়ে এ বই প্রকাশ করছেন। শকুন্তলাবিষয়ক দুর্লভ শিল্পকর্মের কিছু কিছু নিদর্শন পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থিত করার আগ্রহ দমিয়ে রাখা যায়নি। প্রাচীন মৃৎফলকে, আধুনিক ভাস্কর্যে ও রঙ-তুলিতে মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যান বা কালিদাসের নাটকের দৃশ্যাবলী কি রূপমাধুর্য পেয়েছে তার কয়েকটি প্রতিকৃতি না দিলে হয়ত বইখানির উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হোত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এ বিষয়ে স্বেচ্ছায় সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনা না থাকলে একাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতো না। বইখানির অভিনব প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ায় শিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উত্তর প্রদেশের ভিটায় পাওয়া মৃৎফলকের ছবিটি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক

বিভাগের সৌজন্যে ও ১৭৮৯ সালের 'শকুন্তলা'র হিন্দী সচিত্র পুঁথির ছবিগুলো ললিতকলার সৌজন্যে পাওয়া। স্বর্গীয় দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্যের আঁকা 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' মূল চিত্রটি বহুবর্ণ। চিত্রটির প্রতিকৃতি ও উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়ে পাওয়া মৃৎফলকের আলোকচিত্র দিয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা। শিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়-এর রঙীন ছবি দু'খানা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়্যুর সম্পাদক শ্রীকেদার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে পাওয়া। শিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয় তাঁদের আঁকা ছবি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মহাকবির 'শকুন্তলা'র অনুবাদ প্রকাশনায় সাহায্য করায় অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী, ডাঃ মহাদেব সাহা, শ্রীঅরুণ রায়, শিল্পী শ্রীনরেন মল্লিক, শিল্পী শ্রীবন্দনা মুখার্জী, শিল্পী শ্রীনেপাল মুখার্জী, ডাঃ ডি গাঙ্গুলী, শ্রীসুরেন দত্ত, শ্রীসুরপতি মুখার্জী, শ্রীফণিভূষণ বোস, শ্রী বদ্রীনারায়ণ পাল, শ্রীমিহির ঘোষদস্তিদার, শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচীন সেন, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীশ্যামসুন্দর দে, শ্রীসুবোধ রায়, শ্রীঅমরেশ দাশগুপ্ত, শ্রীঅমূল্য দাশগুপ্ত, শ্রীহিমাংশু ব্যানার্জী প্রমুখদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এঁরা ছাড়া আরও অনেক যাঁরা নানা বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।

শতাব্দী প্রেসের কর্মী, প্রবাসী প্রেসের কর্মী, বেঙ্গল অটোটাইপ কোং-এর কর্মী ও মোসলেম খান ব্রাদার্সে'র প্রমুখ কর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের শ্রম ও সুদক্ষ হাতের ছোঁয়া না লাগলে প্রকাশনার এ পরিকল্পনা বাস্তবরূপ পেতো না।

অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাদের সমালোচনা ও অভিমত পাঠালে বাধিত থাকবো।

সর্বশেষে, মহাকবির অমরস্মৃতির প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ও শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজশেখর বসুর (পরশুরাম) আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে চিরায়ত সাহিত্যের প্রথম বই প্রকাশ করলাম।

ছাব্বিশে জানুয়ারী
১৯৫৯

বিনীত
প্রকাশক

অনুবাদকের বক্তব্য

"ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূল গ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা অভিজ্ঞান-শকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন, এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট কালিদাসের ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলের এই রূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া মনে মনে কত শতবার আমায় তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ, বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঠকবর্গ! বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন এই শকুন্তলা দেখিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।"

উদ্ধৃতিটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার বিজ্ঞাপন। তিনি বিদ্যাসাগরই ছিলেন না; বিনয়েরও সাগর ছিলেন। তাঁর লেখা থেকে মহাকবির কাব্যের রস পাওয়া সম্ভব বলে অনেকেই ভাবতে পারেন। বিনয়প্রকাশ তিনি তাই করেছিলেন।

পাঠক হয়ত ভাববেন, এই অনুবাদকের বিনয় তাঁর চাইতেও বেশী হওয়া উচিত। আমি কিন্তু তা ভাবি না। কারণ আমাদের দেশের বুদ্ধিমান পাঠকরা প্রথমেই বুঝতে পারবেন মহাকবির কাব্যের রসের স্বাদ দেয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং, বিদ্যাসাগরের যে ভয় ছিল সে ভয় আমার নেই। পাঠকরা অনুবাদ পড়া সুরু করার আগেই বুঝতে পারবেন, এ অনুবাদ থেকে মহাকবির মূল কাব্যের রসের সামান্য ভগ্নাংশও পাওয়া সম্ভব নয়।

তবুও এই অনুবাদ প্রকাশ করলাম। তার কারণ বলি।

কালিদাসের শকুন্তলা ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক। কাব্য হিসাবেও কালিদাসের শকুন্তলা ভারতীয় সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বিশ্বসাহিত্যের এই

রত্নের স্বাদ, পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায়ই বিতরণের চেষ্টা হয়েছে। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের এই অনুবাদ সেই চেষ্টারই একটা অংশমাত্র।

শকুন্তলার স্বাদ বাংলা ভাষায় বিতরণের যাঁরা চেষ্টা করেছেন সেই রসিক পণ্ডিতসমাজের কথা মনে করলে স্বীকার করতেই হবে যে, এই অনুবাদক কখনোই উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হবে না।

তবে আধুনিক বাংলা গদ্যে আর কোন আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই অনুবাদ প্রকাশের একটা কারণ তাই।

আর এই অনুবাদ প্রকাশ করা হল এই ভরসায় যে, অন্যান্য গুণীরা যখন আরও সরস বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করবেন তখন স্বাভাবিক নিয়মেই এই অনুবাদ অপ্রচলিত হয়ে যাবে।

ভাষান্তরিত করলে যে কোন কাব্যেরই রূপ-রসের পরিবর্তন হয়। অক্ষম হাতে পড়লে রসের হানিও ঘটে। তাইতে যে কোন অনুবাদেই রূপ-রসের পরিবর্তন খানিকটা হয়েছে ধরে নেয়া উচিত। এ অনুবাদ তার ব্যতিক্রম নয়। বরং অনুবাদকদের তালিকায় এই অনুবাদক সবচাইতে নিকৃষ্ট হওয়ায় রসের হানি যে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে ভরসা এই, মহাকবির কাব্যরসের অনন্ত ভাণ্ডারের হানি হয়েও অনেকটাই থাকবে।

তাছাড়া আত্মসমর্থনের কতকগুলো যুক্তিও আমাদের আছে।

আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকরা সংস্কৃত ভাষাবিদ্ নন। সেই জন্য কালিদাসের শকুন্তলার রসগ্রহণ করতে তাদের সংস্কৃত ভাষা ছাড়াই চেষ্টা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে যে অনুবাদ সে অনুবাদ শুধু বাংলা ভাষায় হলেই হবে না, যতটা সহজ বাংলায় হয় ততই ভাল। সেই হিসাবে আমরা আধুনিক চলতি বাংলাকেই অনুবাদের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছি।

এতে শুধু যে পাঠকদের সুবিধা হবে তাই নয়। যদি কেউ এই নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন তাঁদেরও সুবিধা হবে। কালিদাসের শকুন্তলা পৃথিবীর অনেক ভাষায়ই অভিনীত হয়েছে। আধুনিক বাংলা ভাষায় যদি এর অভিনয় হয় আর সেই অভিনয় যদি জনপ্রিয় হয় তাহলে মহাকবির ভক্তমাত্রই আনন্দিত হবেন। এই অনুবাদের এও একটি কারণ।

মহাকবি কালিদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যা শোনা যায় সবই কিম্বদন্তী নির্ভর। প্রামাণ্য কিছুই নেই। তা হয়ত

একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। কারণ মহাকবি ছাড়া কালিদাসের অন্য পরিচয় বাহুল্যমাত্র।

কালিদাসের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতরা এখনো একমত হতে পারেননি। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে ৬।৭ শ' বছর পর্যন্ত কোন না কোন সময়কে কালিদাসের আবির্ভাব কাল বলে বিভিন্ন পণ্ডিতরা দাবী করেছেন। তবে গুপ্তসম্রাটদের আমলেই কালিদাসের আবির্ভাব বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত। বিশেষ করে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভা কালিদাস অলঙ্কৃত করেছিলেন বলে একটা বহুল প্রচলিত মত আছে। এ সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক গ্রন্থান্তরে অনুসন্ধান করতে পারেন।

ভারতবর্ষ শব্দের অর্থ ভরতের দেশ। শকুন্তলা-দুষ্মন্ত মহারাজ ভরতের মা-বাবা। এঁদের কাহিনী মহাভারত থেকে সুরু করে ভারতীয় সাহিত্যের নানা বইয়ে ছড়িয়ে আছে। তবে অনসূয়া, প্রিয়ংবদা আর শকুন্তলা নিয়ে এই কাহিনী অনেকাংশে পূর্বনির্ভর হলেও রূপে, রসে, ভাবে, বৈচিত্র্যে তা মহাকবি কালিদাসের নিজস্ব।

কালিদাসের শকুন্তলার বহু পাঠ আমাদের দেশে পরিচিত। পাঠগুলোর পরস্পর অনৈক্য প্রচুর। পণ্ডিতরা আবার এই পাঠগুলোকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, বাংলা, দেবনাগরী, কাশ্মীরী আর দক্ষিণ ভারতীয়।

মহাকবির লেখা মূলের কোন বিশ্বস্ত নকল পাওয়া যায়নি।

তবে বিশ্বসাহিত্যে শকুন্তলার যে পাঠ প্রচলিত তা প্রধানত বাংলা পাঠনির্ভর। এই অনুবাদেও সেই পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

যদি মূল থেকে বেশী কিছু না থাকে, একটুও কম কিছু না থাকে আর যদি প্রমাণ অসিদ্ধ কোন ভাবান্তরণ না থাকে তাহলেই তাকে অনুবাদ বলা উচিত বলে অনুবাদকের ধারণা। এই অনুবাদে যতদূর সম্ভব সেই নিয়ম মেনে চলতে চেষ্টা করেছি।

তবে বাংলা ভাষার গঠনরীতি. প্রকাশরীতি, সংস্কৃত ভাষা থেকে অন্য রকম। সেই জন্যে অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদকে বিচ্যুতি বলে মনে হতে পারে। যেমন অনেক জায়গায় একটি সমাসবদ্ধশব্দবহুল বাক্যকে ভেঙে একাধিক বাক্যে অনুবাদ করা হয়েছে। বড় বাক্যকে ভেঙে একাধিক ছোট বাক্য করা হয়েছে। অনেক জায়গায় মূলের বাচ্য অনুবাদে পরিবর্তিত হয়েছে। মূলের বাক্যালঙ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদে ব্যবহার করা হয়নি। অথচ

অনেক জায়গায় বাংলা অনুবাদে জোর দেবার জন্যে কিংবা অর্থ স্পষ্ট করার জন্যে মূলে বাক্যালঙ্কারের উপস্থিতির সুযোগ নেয়া হয়েছে।

কিন্তু এ সবই করা হয়েছে বাংলা বাক্যের গঠনরীতি, প্রকাশরীতির জন্যে।

এ ছাড়া যদি কোথাও কোন বিচ্যুতি হয়ে থাকে তাহলে সহৃদয় পাঠকরা দেখিয়ে দিলে বাধিত হব।

অনুবাদে আমরা বাঙলা ভাষার পুরো শব্দ সম্ভারেরই সুযোগ নিয়েছি। অর্থাৎ তৎসম, তৎভব, দেশজ, বিদেশী সব শব্দই ব্যবহার করেছি।

মূল বইটি খানিকটা গদ্যে আর খানিকটা শ্লোকে লেখা, অনুবাদে কিন্তু কেবল গদ্যই ব্যবহার করা হয়েছে।

মহাকবির ছন্দের সমস্ত রস ছন্দনির্ভর বাংলায় আনা আমার সম্ভব মনে হয়নি। অথচ সেই চেষ্টা করতে গেলে মূলের অর্থের সঙ্গে অনুবাদের অসঙ্গতি বেড়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাইতে মহাকবির ছন্দ আর ধ্বনির ঐশ্বর্য এই অনুবাদে নেই। মহাকবি ছিলেন ছন্দের যাদুকর, তাইতে সে ঐশ্বর্য না থাকা মানে কাব্যের অনেকটাই না থাকা। কোন পাঠক যদি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করতে চান তাহলে তাঁর মূলের সন্ধান ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তবে মূলের শ্লোকাংশ এই অনুবাদে ছোট ছোট লাইনে ছাপা হয়েছে। তাই দেখে পাঠক অনুবাদের কোন অংশ শ্লোকের অনুবাদ তা বুঝতে পারবেন।

তাছাড়া কিছুসংখ্যক শ্লোক মূল সংস্কৃত ভাষায় পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে। এই শ্লোক উদ্ধৃতি অঙ্ক অনুক্রমে সাজানো। সুতরাং রসিক পাঠক হয়ত খানিকটা রস পেতেও পারেন।

মূল বইটি সংস্কৃত, উচ্চশ্রেণীর প্রাকৃত আর নিম্নশ্রেণীর প্রাকৃত এই তিন ভাষায় লেখা। এই অনুবাদে কিন্তু আধুনিক কথ্য বাংলাভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। তবে গ্রন্থারম্ভের আগে পাত্রপাত্রীদের পরিচয় যেখানে দেয়া হয়েছে সেখানে কে কোন ভাষায় কথা বলেছে তা দেয়া আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হয়ত এতে কিছু সুবিধা হতে পারে।

পাঠকের অসুবিধা হবার ভয়ে মূল অনুবাদ পাদটীকা কলঙ্কিত করা হয়নি। অনুবাদে পারিভাষিক শব্দ প্রায় সবই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে পরিশিষ্টের টীকা অধ্যায়ে পারিভাষিক শব্দের সংক্ষিপ্ত টীকা দেয়া আছে। এ ছাড়া কিছু সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নেই, সে সব ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত শব্দই রেখেছি। তবে পরিশিষ্টে সেই শব্দগুলি সম্বন্ধে টীকা দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্টে বিশ্বসাহিত্যে মহাকবির স্থান সম্পর্কে পাঠক সমাজকে সচেতন করার জন্যে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত, সুতরাং এ থেকে বিশ্বসাহিত্যে মহাকবির প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। যে ধারণা হবে তা আংশিক। এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান পেতে হলে পাঠককে বিস্তৃত অধ্যয়ন করতে হবে।

যুগ যুগ ধরে অনেক রসিক পণ্ডিতই শকুন্তলা কাব্যের রসবিচার করতে চেষ্টা করেছেন। বামন হয়ে চাঁদের দূরত্ব মাপার মত হাস্যকর প্রচেষ্টা হবে বলে আমি সে চেষ্টা করিনি। তবে এ কাব্যের রসবিচারে যে কটি প্রবন্ধ দেখেছি তার ভিতরে 'প্রাচীন সাহিত্যে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা" আর "শকুন্তলা" এই দুটি প্রবন্ধই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। উৎসাহী পাঠককে সেই প্রবন্ধ দুটি পড়তে আমি অনুরোধ করি।

উপসংহারে অযোগ্য হাতে এই মহান দৃশ্যকাব্যের অনুবাদের চেষ্টা করে যে ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছি তার জন্যে সুধী সমাজের কাছে ক্ষমা চাইছি। আর তাঁদের অনুরোধ করছি, আমার অনিচ্ছাকৃত কিংবা অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল-ত্রুটিগুলো যেন অনুগ্রহ করে তাঁরা আমাকে দেখিয়ে দেন। ইতি—

কলিকাতা বিনীত

২৬শে জানুয়ারী শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

১৯৬৯

নাটকের পাত্র-পাত্রী

॥ পুরুষ ॥

যাঁরা সংস্কৃতে কথা বলেছেন :

সূত্রধার।

দুষ্মন্ত—নায়ক, হস্তিনাপুরের রাজা।

বাতায়ন—কঞ্চুকী।

সোমরাত—রাজপুরোহিত।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি।

কাশ্যপ—(কণ্ব)—প্রধান ঋষি। নায়িকা শকুন্তলার পালক-পিতা।

বৈখানস, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতম, নারদ—কণ্বের শিষ্য।

মারীচ—স্বর্গীয় ঋষি, ইন্দ্রের বাবা।

গালব—মারীচের শিষ্য।

রাজার সারথি, সেনাপতি, দুজন ঋষিকুমার, দুজন বৈতালিক, যজমানশিষ্য।

যাঁরা উচ্চশ্রেণীর প্রাকৃত বলেছেন :

সর্বদমন (ভরত)—দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ছেলে।

মাধব্য—বিদূষক।

রৈবতক—রাজকর্মচারী।

করভক—রাজমাতার দূত।

মিত্রাবসু—রাজার শালা (নগরপাল)।

যাঁরা নিম্নশ্রেণীর প্রাকৃত বলেছেন :

সূচক, জানুক—দু'জন রক্ষী।

কুম্ভীলক—জেলে।

গৌতমী—কণ্বের আশ্রমের বৃদ্ধা তপস্বিনী।

অদিতি (দাক্ষায়ণী)—মারীচের স্ত্রী।

পরভৃতিকা, মধুকরিকা, চতুরিকা,—রাজার অন্তঃপুরের পরিচারিকা। সানুমতী অপ্সরা—মেনকার বান্ধবী।

সুব্রতা—ও তার বান্ধবী।

মারীচের আশ্রমের দু'জন তপস্বিনী।

যবনী।

॥ নাটকে যাঁদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে ॥

দুষ্মন্তের মা।

হংসপদিকা আর বসুমতী—দুষ্মন্তের দুই স্ত্রী।

তরলিকা—বসুমতীর পরিচারিকা।

পিশুন—দুষ্মন্তের মন্ত্রী।

ধনমিত্র—একজন বণিক।

ইন্দ্র—দেবরাজ।

পৌলমী—ইন্দ্রের স্ত্রী।

জয়ন্ত—ইন্দ্রের ছেলে।

কালনেমী আর তার সন্তানরা—দানব

নারদ, দুর্বাসা—ঋষি।

বিশ্বামিত্র (কৌশিক)—শকুন্তলার বাবা।

মার্কণ্ডেয়—একজন ঋষিকুমার।

বৃদ্ধশাকল্য—মারীচের আশ্রমের একজন ঋষি।

মেনকা—স্বর্গের অপ্সরা। শকুন্তলার মা।

নটী—তা বটে। আর্য, এবার বলুন এর পর কি করতে হবে।

সূত্রধার—এই সভাকে শুনিয়ে খুশি করা ছাড়া আর কি? তাহলে নতুন আসা উপভোগ করার মতন সুন্দর এই গরমকাল নিয়ে একটা গান কর।—

এখন অবগাহন করে আরাম। বনের হাওয়ায়
পাটলফুলের সৌরভ, নিবিড় ছায়ায় ঘুম সহজেই
আসে, দিনগুলো শেষের দিকে সুন্দর।

নটী—বেশ।—

(গান)

সুন্দরীরা শিরীষ পরছেন বড় দরদ দিয়ে, কোমল
কেশর শিরীষ, যে শিরীষে মৌমাছিরা একটু
একটু চুমু খেয়ে যায়।

সূত্রধার—আর্যা, সুন্দর গেয়েছ। সুরের বাঁধনে বাঁধা মন সবাই যেন ছবির মতন হয়ে গিয়েছে, এখন কোন্ নাটক দিয়ে এঁদের সেবা করি?

নটী—কেন? আর্যমিশ্র ত প্রথমেই বলেছেন, অভিজ্ঞানশকুন্তল নামে অপূর্ব নাটক অভিনয় করতে হবে।

সূত্রধার—আর্যা, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। এ সময়ে আমি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। কেননা,—

হরিণ বড় জোরে দৌড়োয়, সে এই রাজা
দুষ্মন্তকে যেমন জোর করে নিয়ে এসেছে, তেমনি
তোমার সুন্দর গানের সুর আমার মনকে সরিয়ে
এনেছে।

(দুজনে বেরিয়ে যায়)

প্রস্তাবনা শেষ।

(তারপর বাণজোড়া ধনুক হাতে হরিণের পিছনে পিছনে রাজা আর সারথির প্রবেশ)

সারথি—(রাজা আর হরিণের দিকে তাকিয়ে) আয়ুষ্মান্—
গুণ পরাণো ধনুক হাতে আপনার দিকে আর কৃষ্ণ-
সার হরিণের দিকে তাকিয়ে আমি যেন সাক্ষাৎ
শিবকেই হরিণকে অনুসরণ করতে দেখছি।

রাজা—সারথি, ওই হরিণ আমাদের দূরে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু—
দেখ, এখন ও পিছন থেকে বার বার ধেয়ে আসা
রথের দিকে তাকিয়ে, ঘাড় বাঁকানো সে দৃষ্টি
বড় সুন্দর—বাণের আঘাতের ভয়ে শরীরের
পিছনের বেশির ভাগকে সামনের দিকে গুটিয়ে
নিয়ে, ক্লান্তিতে খুলে যাওয়া মুখ থেকে ঝরে
পড়া আধখাওয়া কুশে পথ ছেয়ে দিয়ে, বড় বড়
লাফে শূন্য দিয়েই বেশির ভাগ আর অল্পই মাটি
ছুঁয়ে চলেছে।

তাহলে পিছন থেকে তাড়া করা সত্বেও আমার কেন চেষ্টা করে ওর দিকে নজর রাখতে হচ্ছে ?

সারথি—আয়ুষ্মান্, মাটি উঁচুনীচু বলে আমি রাশ টেনে রথের বেগ কমিয়েছি। তাই হরিণ এত দূরে। এখন আপনি সমান জমিতে এসেছেন, ওকে পেতে কষ্ট হবেনা।

রাজা—তাহলে রাশ ছাড়।

সারথি—আয়ুষ্মাণের যা আদেশ। (রথের বেগ দেখিয়ে) আয়ুষ্মান,
দেখুন দেখুন—

যেন ছুটছে। ওরা ওদের সামনেটা মেলে দিয়েছে। ওদের চামর শিখা কাঁপছেনা; কাণগুলো খাড়া আর নিজেদের তোলা ধুলোও ওদের হারিয়ে যেতে পারছে না।

রাজা—সত্যিই ঘোড়াগুলো হরিৎ আর হরিদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছে—
দেখ, রথের বেগে মুহূর্তও কিছু আমার পাশে থাকছেনা, দূরে থাকছেনা; যেটা দেখতে ছোট হঠাৎ সেটা হয়ে উঠ্ছে বড়। সত্যি যা আলাদা তা হয়ে যাচ্ছে যেন একসাথ; আসলে যা বাঁকা সেটাও চোখে লাগছে সোজা।

সারথি—দেখ, ওকে মারছি

(বাণ মারার ভঙ্গি করলেন)

(নেপথ্যে)

রাজা, রাজা—এটা আশ্রমের হরিণ—মারবেন না, মারবেন না।

সারথি—(শুনে, দেখে)—আয়ুষ্মান্, আপনার বাণের পথের ওই কৃষ্ণসার আর আপনার মাঝে তপস্বীরা হাজির হয়েছেন।

রাজা—(সসম্ভ্রমে) তাহলে ঘোড়াগুলোকে থামাও।

সারথি—যে আজ্ঞে। (রথ থামায়)

(শিষ্যের সাথে তাপসের প্রবেশ)

তাপস—(হাত তুলে) রাজা, ওটা আশ্রমের হরিণ, মারবেন না—মারবেন না।—

তুলোর গাদায় আগুনের মতন এই নরম হরিণের গায়ে বাণ মারবেন না, মারবেন না। আহা, কোথায় হরিণের ছানাদের অতি ঠুনকো জীবন, আর কোথায় আপনাদের বজ্রের মতন ধারাল বাণ।

ধনুকে ভালভাবে জোড়া আপনার বাণটি তাহলে
ফিরিয়ে নিন। অস্ত্র আপনাদের বিপন্নদের রক্ষা
করার জন্তে, নিরপরাধকে মারবার জন্তে নয়।

রাজা—এই ফিরিয়ে নিলুম (এই বলে যা বলা তাই করেন)

তাপস—পুরুবংশের আপনি গৌরব, এ আপনার যোগ্য কাজ।—

পুরুবংশে আপনার জন্ম, এ কাজ আপনারই
উপযুক্ত। আপনার এইরকম গুণী চক্রবর্তী ছেলে
হোক।

রাজা—(প্রণাম করে) গ্রহণ করছি।

তাপস—রাজা, আমরা সমিধ সংগ্রহে বেরিয়েছি, মালিনীর তীর বরাবর
কুলপতি কাশ্যপের এই আশ্রম দেখা যাচ্ছে। অন্য কাজের
ক্ষতি না হলে যেয়ে অতিথি সংকার গ্রহণ করুন। তা ছাড়া—

তপোধনদের নির্বিঘ্ন সুন্দর ক্রিয়াকর্ম দেখে
আপনি বুঝবেন— "ছিলার কড়াপড়া আমার
হাত কতটা রক্ষা করে।"

রাজা—কুলপতি কি ওখানে আছেন?

তাপস—ইদানীং মেয়ে শকুন্তলাকে অতিথি সংকারের ভার দিয়ে তার
প্রতিকূল দৈব বারণ করতে সোমতীর্থে গিয়েছেন।

রাজা—বেশ, তাঁর সঙ্গেই দেখা করি। তিনি আমার ভক্তি জেনে
নিশ্চয়ই মহর্ষিকে বলবেন।

তাপস—তা হলে যাচ্ছি।

(এই বলে শিষ্যদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন)

রাজা—সারথি, ঘোড়া চালাও, পুণ্য আশ্রম দেখে নিজেকে পবিত্র
করি।

সারথি—আয়ুষ্মাণের যে আদেশ—

(এই বলে আবার রথের বেগ দেখতে থাকেন)

রাজা—(চার দিকে দেখে) সারথি, না বললেও বোঝা যায় যে এটা
তপোবনের কাছে।

রাশ ছাড়ার পর ঘোড়াগুলো হরিণের পিছনে বেগেই যেন ছুটছে। ওরা ওদের সামনেটা মেলে দিয়েছে। ওদের চামর শিখা কাঁপছেনা; কাণগুলো খাড়া আর নিজেদের তোলা ধুলোও ওদের ছাড়িয়ে যেতে পারছে না।

রাজা—সত্যিই ঘোড়াগুলো হরিৎ আর হরিণদেরও ছাড়িয়ে [illegible]

[illegible], আর জলাশয়ের পথে বল্কলের ধার থেকে ঝরেপড়া জলের রেখা আঁকা।

সারথি—ঠিকই সব।

রাজা—(কিছু দূরে যেয়ে) তপোবনের লোকদের যেন অসুবিধা না হয়। এখানেই রথ রাখ, আমি নামছি।

সারথি—রাশ ধরেছি। আয়ুষ্মান্ নামুন।

রাজা—(নেমে) সারথি, তপোবনে বিনীত বেশে ঢুকতে হয়। এগুলো তাহলে রাখ। (সারথিকে অলঙ্কার আর ধনুক দিয়ে) সারথি, আমি আশ্রমের লোকদের সাথে দেখা করে আসতে আসতে তুমি ঘোড়াগুলোর গা ধুইয়ে দাও।

সারথি—যে আজ্ঞে। (বেরিয়ে যায়)

রাজা—(ঘুরে দেখে) এই আশ্রমের দরজা, ভিতরে যাই।—

(ঢোকার পর নিমিত্ত লক্ষ্য করে)

শান্ত এই আশ্রম—হাত কিন্তু নড়ছে। এর ফল
এখানে কোথা থেকে আসবে? নাকি ভবিতব্যের
দরজা সব জায়গায়?

(নেপথ্যে)—এদিকে, এদিকে সখীরা।

রাজা—(কান দিয়ে) ও, বাগানের ডান দিকে আলাপের মতন শোনা যাচ্ছে, ওখানে যাই। (যেয়ে দেখে) ও, এই মুনির মেয়েরা নিজেদের মতন মাপের জল দেবার কলসী নিয়ে চারা গাছে জল

ধনুকে ভালভাবে জোড়া আপনার বাণটি তাহলে
ফিরিয়ে নিন। অস্ত্র আপনাদের বিপন্নদের রক্ষা
করার জন্যে, নিরপরাধকে মারবার জন্যে নয়।

[illegible]

এই [illegible] করি।

(এই বলে তাকিয়ে রইলেন)

(তারপর সখীদের সাথে যেমন বলা হয়েছে তেমনিভাবে শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা—এদিকে, এদিকে সখীরা।

অনসূয়া—শকুন্তলা, মনে হয় এই আশ্রমের গাছগুলোকে তাত কাশ্যপ তোর চাইতেও বেশী ভালবাসেন। কারণ, তুই নবমল্লিকা ফুলের মতন নরম হলেও তোকে এদের আলবালে জল দিতে নিয়োগ করা হয়েছে।

শকুন্তলা—অনসূয়া, কেবল বাবার কথায়ই নয়। আমিও এদের ভাইয়ের মতন ভালবাসি।

(এই বলে জল দেবার ভঙ্গি করে)

রাজা—সে কি? এ কণ্বের মেয়ে? মাননীয় কাশ্যপের বিবেচনা নেই। একে আশ্রম ধর্মে নিয়োগ করেছেন।—

আভরণ ছাড়াই মনোহর এই তনু—একে
যে ঋষি তপস্যার উপযুক্ত করতে চাইছেন,
তিনি নিশ্চয়ই নীলপদ্মের পাতার ধার দিয়ে
শমীগাছের ডাল কাটতে চেষ্টা করছেন।

যা হোক, গাছের আড়াল থেকে নিঃসঙ্কোচ অবস্থায় একে দেখি।

(তাই করলেন)

শকুন্তলা—(দাঁড়িয়ে) সখী অনসূয়া, প্রিয়ংবদা আমাকে খুব এঁটে বল্কল পরিয়েছে, এটা ঢিলে করে দে।

অনসূয়া—বেশ, (এই বলে ঢিলে করে দেয়)

প্রিয়ংবদা—(হেসে) স্তন বড় করেছে নিজের যৌবন। এ ব্যাপারে তাকে দোষ দে।

রাজা—স্বীকার করতেই হবে বল্কল এর তনুর যোগ্য নয়; তা বলে আভরণে রূপ যতটা বাড়িয়ে দিত বল্কলে তা করছেনা, তা নয়। কেননা—

পিছনে শ্যাওলা লেগে থাকলেও পদ্ম সুন্দর,
চাঁদের কলঙ্ক ময়লা হলেও রূপ বাড়িয়েই দেয়।
এই তন্বী বল্কলে আরও মনোরম। গড়ন যার
সুন্দর তার কি না আভরণ ?

শকুন্তলা—(সামনে তাকিয়ে) এই বকুল, হাওয়ায় দোলা কচিপাতা-ওয়ালা ডালের আঙুল দিয়ে যেন আমায় তাড়াতাড়ি যেতে বলছে। ওকে আদর করি। (এই বলে চলতে থাকে)

প্রিয়ংবদা—শকুন্তলা, এখানেই একটু দাঁড়া।

শকুন্তলা—কেন ?

প্রিয়ংবদা—তুই কাছে যাওয়াতে মনে হচ্ছে, যেন এই বকুলগাছের লতার সাথে মিলন হয়েছে।

শকুন্তলা—এই জন্যেই তুই প্রিয়ংবদা।

রাজা—প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে প্রিয় হলেও সত্যি কথা বলেছে।—

অধরে এর কচিপাতার রঙ, হাত দুটো যেন
কোমলশাখা আর ফুলের মতন লোভনীয় যৌবন
অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে।

অনসূয়া—শকুন্তলা, আমগাছের এই স্বয়ংবর বধূ নবমল্লিকা, যার তুই নাম দিয়েছিস বনজ্যোৎস্না। ওকে ভুলে গেলি নাকি ?

শকুন্তলা—তা হলে নিজেকেও ভুলে যাব (লতার কাছে যেয়ে দেখে) ওলো, সুন্দর সময়ে এই লতা আর গাছ দুয়ের মিলন হয়েছে। বনজ্যোৎস্না পেয়েছে নতুন ফুলের যৌবন আর আমগাছও পেয়েছে নতুন পাতা। এখন উপভোগ করতে পারে।

(দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল)

কণ্বমুনির আশ্রমে পরিত্যক্ত শিশু শকুন্তলা

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎ

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে 'শকুন্তলা'র হিন্দী অনুবাদের সচিত্র পাণ্ডুলিপি থেকে

'চিত্র পরিচিতি' দেখুন।

প্রিয়ংবদা—অনসূয়া, শকুন্তলা কেন বনজ্যোৎস্নাকে বেশি বেশি দেখে জানিস ?

অনসূয়া—আমি ভাবিনি ত, তুই বল !

প্রিয়ংবদা—"বনজ্যোৎস্নার যেমন নিজের উপযুক্ত গাছের সাথে মিলন হয়েছে—আমিও কি তেমন নিজের মতন বর পাব ?" এই জন্য।

শকুন্তলা—এ নিশ্চয়ই তোর নিজের মনের কথা।

(এই বলে কলসী ঢালে)

রাজা—এ কি কুলপতির অসবর্ণ স্ত্রীর মেয়ে ? তবে সন্দেহের কারণ নেই—

আমার সাধু মন যখন একে চাইছে, তখন
নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের সাথে ওর বিয়ে হতে পারে।
ভাল লোকের যেসব জিনিসে সন্দেহ হয় তাতে
মনের প্রবৃত্তিই সত্য বোঝার উপায়।

তা হলেও খবর নিয়ে এর সম্বন্ধে জানব।

শকুন্তলা—(ভয় পেয়ে) ও মা, জল ঢালায় নবমল্লিকা ছেড়ে উঠে মৌমাছি আমার মুখের দিকে আসছে।

(এই বলে মৌমাছিকে বাধা দেবার ভঙ্গি করে)

রাজা—(সতৃষ্ণভাবে দেখে)—

মৌমাছি তুমিই কৃতী, হাত দিয়ে যে বাধা
দিচ্ছে আর অপাঙ্গ যার চঞ্চল, সেই কাঁপন লাগা
চোখ বার বার ছুঁয়ে দিচ্ছ। যে গোপন কথা বলে
তার মতন কানের কাছে ঘুরে ঘুরে একটু একটু
গুন্‌গুন্ করছ—ভালবাসার যা সব কিছু, সেই
অধর পান করছ—আমরা খবর খুঁজে মরেছি।

শকুন্তলা—এর লজ্জা নেই, থামছে না। অন্যদিকে যাব। (অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে) একি, এদিকেও আসছে, ওলো, বাঁচা আমাকে—বাঁচা। এই দুষ্ট, অভদ্র মৌমাছি আমাকে জ্বালাতন করছে।

(দুজনে হেসে) আমরা বাঁচাবার কে ? দুষ্মন্তকে ডাক। তপোবন রক্ষা রাজার কাজ।

রাজা—আত্মপ্রকাশের এই সময়, ভয় নেই—(এই অর্ধেক বলে মনে মনে) রাজার ভাব প্রকাশ পাবে যে, আচ্ছা এইভাবে বলি।

শকুন্তলা—(অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে)এ কি, এখানেও আমাকে তাড়া করছে।

রাজা—(তাড়াতাড়ি কাছে এসে)—

যাদের বিনয় নেই তাদের শাসন করে পুরুবংশের
লোকেরা, সেই পুরুবংশের লোক যখন পৃথিবী
শাসন করছে তখন তপস্বীদের সরল মেয়েদের
সাথে এ অভদ্র ব্যবহার করছে, এ কে ?

(সবাই রাজাকে দেখে একটু বিচলিত হয়)

অনসূয়া—আর্য, বেশি অনিষ্ট কিছু হয়নি। আমাদের এই প্রিয় সখী দুষ্টু মৌমাছির আক্রমণে বিচলিত হয়েছিল।

(এই বলে শকুন্তলাকে দেখায়)

রাজা—(শকুন্তলার দিকে মুখ করে)

তপস্যা বাড়ছে ত' ?

শকুন্তলা—(ঘাবড়ে যেয়ে চুপ করে থাকে)

অনসূয়া—এখন বিশিষ্ট অতিথি পেয়ে। ওরে শকুন্তলা—যা, কুটীর থেকে ফল আর অর্ঘ্য এনে দে। পা ধোবার জল এই হবে। (এই বলে কলস দেখায়)

রাজা—আপনাদের সত্যি আর মিষ্টি কথাতেই আতিথ্য হয়েছে।

প্রিয়ংবদা—আর্য, তা হলে ছাতিমের ঘনছায়ায় ঠাণ্ডা এই বেদীতে একটু বিশ্রাম করুন।

রাজা—আপনারাও নিশ্চয়ই এই কাজ করে পরিশ্রান্ত হয়েছেন।

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, আমাদের অতিথির সেবা করা উচিত। আয়, আমরা বসি।

(সবাই এই বলে বসে)

শকুন্তলা—(নিজের মনে) এঁকে দেখে আমার তপোবন-বিরোধী মনের ভাব হচ্ছে কেন ?

রাজা—(সবাইকে দেখে) আহা, একইরকম বয়েস আর রূপে সুন্দর আপনাদের বন্ধুত্ব ।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকে) অনসূয়া, এঁকে দেখতে সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত । আলাপ এঁর বুদ্ধিমানের মতন আর মিষ্টি, তাতে মনে হয়, এঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে । ইনি কে ?

অনসূয়া—আমারও কৌতূহল আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করা যাক । (প্রকাশ্যে) আর্যের মিষ্টি আলাপে যে ভরসা পেয়েছি সেই ভরসাই আমাকে কথা বলাচ্ছে । আর্য কোন্ রাজর্ষি বংশের গৌরব ? কোন্ দেশের লোককেই বা আপনি বিরহের দুঃখ দিয়ে এসেছেন ? কেনই বা আপনার এই কোমল শরীর তপোবনের পরিশ্রমের পাত্র করেছেন ।

শকুন্তলা—(আত্মগত) মন উতলা হয়োনা, তুমি যা ভাবছিলে এই অনসূয়া তাই বলছে ।

রাজা— (আত্মগত) এখন কি করে নিজের পরিচয় দিই ?—নিজেকে গোপনই বা করি কি করে ? বেশ এঁকে এই বলি । (প্রকাশ্যে) পুরুবংশের রাজা আমাকে ধর্মাধিকারে নিযুক্ত করেছেন । ধর্মকার্য নির্বিঘ্নে হচ্ছে কিনা জানতে আমি এই তপোবনে এসেছি ।

অনসূয়া—ধর্মচারীরা এবার আশ্রয় পেলেন ।

শকুন্তলা—(প্রণয় লজ্জার অভিনয় করে)

সখীরা—(দুজনের রকম দেখে জনান্তিকে) শকুন্তলা, যদি এখানে আজ বাবা থাকতেন ।

শকুন্তলা—তাহলে কি হত ?

সখীরা—এই বিশিষ্ট অতিথিকে জীবনের সর্বস্ব দিয়েও কৃতার্থ করতেন ।

শকুন্তলা—(রাগের ভান করে) তোরা দূর হ । তোরা কি যেন একটা মনে করে বলছিস । তোদের কথা শুনব না ।

রাজা—আমিও আপনাদের সখী সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করি।

সখীরা—আর্য, এ প্রার্থনা নয়—অনুগ্রহ।

রাজা—ভগবান কাশ্যপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে পরিচিত। আপনাদের এই সখী তাঁর মেয়ে হলেন কি করে?

অনসূয়া—শুনুন আর্য, কোন এক রাজর্ষি আছেন—খুব প্রভাব, তাঁর গোত্র নাম কৌশিক।

রাজা—আছেন শোনা যায়।

অনসূয়া—তাঁকে আমাদের প্রিয়সখীর বাবা বলে জানবেন। ওকে ত্যাগ করা হয়েছিল, তাত কাশ্যপ ওকে লালন-পালন করে বড় করেছেন। তাই তিনি ওর বাবা।

রাজা—ত্যাগ করার কথায় আমার কৌতূহল হচ্ছে। গোড়া থেকে শুনতে চাইছি।

অনসূয়া—শুনুন আর্য, আগে সেই রাজর্ষি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। কি জানি কেন দেবতারা ভয় পেয়ে মেনকা নামে এক অপ্সরা পাঠালেন তপস্যায় বাধা দিতে।

রাজা—অন্যের তপস্যায় এই ভয় দেবতাদের রয়েছে।

অনসূয়া—তারপর প্রথম বসন্তে তার পাগলকরারূপ দেখে—(অর্ধেক বলে লজ্জায় থেমে যায়।)

রাজা—পরে কি হল জানাই যাচ্ছে। মোটের উপর ইনি অপ্সরার মেয়ে।

অনসূয়া—তাই বটে।

রাজা—ঠিক হয়েছে।—

এ রূপ মানুষের হবে কি করে? মাটি থেকে
বিদ্যুৎ ওঠে না।

শকুন্তলা—(মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে)

রাজা—(আত্মগত) আঃ, আমার ইচ্ছা সুযোগ পেয়েছে।

প্রিয়ংবদা—(হেসে শকুন্তলাকে দেখে নায়কের দিকে মুখ করে) আর্য, যেন আবারও বলতে চাইছেন।

শকুন্তলা—(সখীকে আঙুল দিয়ে তর্জন করে)

রাজা—আপনি ঠিক ধরেছেন। সুচরিত শোনবার লোভে আমার আরও একটা প্রশ্ন আছে।

প্রিয়ংবদা—কিন্তু করবেন না। তপস্বীদের কাছে প্রশ্নে কোন বাধা নেই।

রাজা—আপনার সখী সম্বন্ধে জানতে চাইছি যে—

তপস্বীর ব্রত ভালবাসায় বাধা দেয়। উনি
কি বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্রতের সেবা
করবেন? না একরকম চোখের জন্য যারা তার
প্রিয় সেই মৃগবধূদের সঙ্গে চিরকালই থাকবেন?

প্রিয়ংবদা—আর্য, ধর্মাচরণেও এ পরাধীন। কিন্তু এর বাবার ইচ্ছে একে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করেন।

রাজা—(আত্মগত) এ প্রার্থনা হয়ত দুর্লভ নয়—

মন এখন আশা কর। সন্দেহ দূর হয়েছে।
যাকে আগুন বলে ভয় পাচ্ছিলে সে এই রত্ন—
যাকে ছোঁয়া যায়।

শকুন্তলা—(যেন রাগ করে), অনসূয়া, আমি চললুম।

অনসূয়া—কারণ?

শকুন্তলা—এই প্রিয়ংবদা যা তা বলছে, এর কথা আর্যা গৌতমীকে বলব। (এই বলে ওঠে)

অনসূয়া—বিশিষ্ট অতিথির সৎকার হয়নি, তাকে ছেড়ে ইচ্ছামত যাওয়া ঠিক নয়।

শকুন্তলা—(কিছু না বলে চলতেই লাগল)

রাজা—(স্বগত) আঃ, কেন যাচ্ছে।

(ধরতে যেয়ে নিজেকে সংবরণ করে নিজের মনে)

আহা প্রণয়ীর মনের ইচ্ছা যেন কাজেরই মতন।
আমি—
হঠাৎ মুনির মেয়ের অনুসরণ করতে গেলে

বিনয় আমাকে এগোতে বাধা দিল। জায়গা
থেকে না উঠেই যেন যেয়ে আবার ফিরে এলাম।

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাকে বাধা দিয়ে) ওলো, তোর যাওয়া ঠিক নয়।

শকুন্তলা—(ভুরু কুঁচকে) কি কারণ ?

প্রিয়ংবদা—গাছে জল দেয়াতে তোর আমার কাছে দুটো ধার আছে। আয়, নিজেকে খালাস করে তারপর যাবি।

(জোর করে ওকে থামায়)

রাজা—ভদ্রে, দেখছি গাছে জল দিয়েই উনি হাঁপিয়ে পড়েছেন। দেখুন ওঁর—

কলসী তুলতে তুলতে হাত দুটো কাঁধ থেকে
শিথিল হয়েছে, হাতের তালু দুটো বড় লাল
হয়েছে। অস্বাভাবিক শ্বাসে এখনও ওঁর স্তন
কাঁপছে; মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে,
কানের শিরীষ আটকে গিয়েছে; বাঁধন খুলে
যাওয়া এলোচুলগুলো এক হাতে ধরে রয়েছেন।

আমিই এঁকে ঋণ মুক্ত করছি।

(আংটি দিতে চাইছেন)

দুজনে—(নাম লেখা আংটির অক্ষরগুলো পড়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়।)

রাজা—আমাকে অন্য কিছু ভাববেন না। এটি রাজার দান।

প্রিয়ংবদা—তাহলে এ আংটি আঙুল থেকে সরানো ঠিক নয়। আর্যের কথায় ও এখন ঋণ মুক্ত হল। (একটু হেসে) ওলো শকুন্তলা, দয়ালু আর্য, না হয় মহারাজ তোকে মুক্ত করেছেন। এখন যা।

শকুন্তলা—(আত্মগত) যদি নিজের মনে জোর থাকত। (প্রকাশ্যে) তুই আমাকে ছেড়ে দেবারই বা কে আর রাখবারই বা কে ?

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে আত্মগত) এঁর উপরে আমার যেমন, আমার উপরেও কি এঁর তেমনি ভাব ? না কি আমার চাইবার সুযোগ হয়েছে। কেন না—

যদিও আমার কথায় কথা বলছে না, আমি কথা বললে মন দিয়ে শুনছে। আমার মুখের সামনেও দাঁড়াচ্ছে না সত্যি কিন্তু অন্য বিষয়ে ওর বেশি দৃষ্টি নেই।

(নেপথ্যে)—তপস্বীরা সবাই শুনুন, তপোবনের সবাইকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসুন। রাজা দুষ্মন্ত শিকার করতে করতে কাছে এসেছেন।—

ঘোড়ার খুরে ওঠা অস্তগামী সূর্যের রঙের ধুলো পঙ্গপালের মতন আশ্রমের গাছগুলোর ডালে মেলা, জলে ভেজা বল্কলগুলোতে পড়ছে। আরও রথ দেখে ভয় পেয়ে একটা হাতী হরিণের পালকে ছত্রভঙ্গ করে আমাদের তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের মতন ধর্মারণ্যে ঢুকেছে। তার একটা দাঁতে তীব্র আঘাতে ভাঙ্গা গাছের ডাল লেগে আছে ; খেলার জন্যে টেনে আনা লতার বালার আকর্ষণ তার বাঁধন হয়েছে।

সকলে—(কান দিয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে)

রাজা—(আত্মগত) ছি ছি—পুরবাসীরা আমাকে খুঁজতে গিয়ে তপোবনে উপদ্রব করছে। যা হোক, এবার ফিরে যাই।

সখীরা—আর্য, এই বুনোজন্তুর খবরে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি, আমাদের কুটীরে ফেরার অনুমতি দিন।

রাজা—(ব্যস্ত হয়ে) আপনারা আসুন। আমরাও আশ্রমের অসুবিধা যাতে না হয় সেই চেষ্টা করছি। (সবাই উঠে দাঁড়ান)

সখীরা—আর্য, অতিথিসৎকার করতে পারিনি। আবার দেখা হবার কথা আর্যকে বলতে লজ্জা করছে।

রাজা—না, তা নয়। আপনাদের সাথে দেখা হওয়াই আমার পুরস্কার।

শকুন্তলা—অনসূয়া, নতুন কুশের সূচে আমার পা বিঁধেছে, আর বল্কলও কুরুবকের ডালে আটকে গিয়েছে। আমার জন্যে

বিনয় আমাকে এগোতে বাধা দিল। জায়গা
থেকে না উঠেই যেন যেয়ে আবার ফিরে এলাম।

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাকে বাধা দিয়ে) ওলো, তোর যাওয়া ঠিক নয়।

শকুন্তলা—(ভুরু কুঁচকে) কি কারণ •

শরীর যাচ্ছে সামনে আর বাতাসের উল্টো দিকে
নেয়া নিশানের রেশমের মতন অস্থির মন ছুটছে
পিছন দিকে।
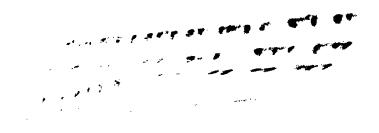
(সবাই বেরিয়ে যায়)
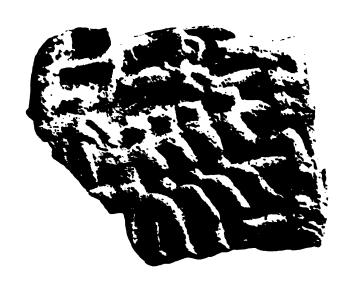
উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়ে পাওয়া শকুন্তলা বিষয়ক মৃৎ-ফলক

আনুমানিক খৃঃ পূঃ প্রথম শতক

দ্বিতীয় অঙ্ক

(তারপর মন খারাপ বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—(নিঃশ্বাস ফেলে) হায়রে অদৃষ্ট, এই শিকারী রাজার বন্ধুত্বে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। এই হরিণ, এই শুয়োর, এই বাঘ, এই বলে দুপুর বেলাতেও গাছের ছায়া কমে আসা বন থেকে বনে ছুটোপাটি করতে হয়; পাহাড়ী নদীর পাতা পড়ে কষা জল খেতে হয়। খেতে হয় অবেলায়—যা খাওয়া হয় তার বেশির ভাগই শিকে রান্না করা মাংস। ঘোড়ার পিছনে ছুটে ছুটে গিড়েগাঁট সব ঢিলে—রাত্তিরে পর্যন্ত ভাল ঘুমুতে পারি না। তারপর কাক ভোরেই বাঁদীর ব্যাটা পাখী শিকারীগুলোর বন ঘেরাও করার হৈ-হল্লায় ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এতেও এখন যন্ত্রণা যাচ্ছেনা। তারপর হয়েছে ঘ্যাগের উপর বিষ ফোঁট। কাল আমরা যখন ছিলাম না তখন শিকারের পিছনে পিছনে আশ্রমে ঢুকলে, আমার দুর্ভাগ্য, ওঁকে ঋষির মেয়ে শকুন্তলাকে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন নগরে ফেরার মন কিছুতেই করছেন না। এইরকম ভাবতে ভাবতে আমার চোখের সামনে রাত পুইয়ে গেল। কি হবে। যাক, উনি এখন সকাল বেলার কাজকর্ম সেরেছেন—ওর সঙ্গে দেখা করি। (এগিয়ে দেখে) এই যে প্রিয়বন্ধু এ দিকেই আসছেন। বনফুলের মালা পরা ধনুক হাতে যবনীরা ঘিরে রয়েছে। যাক্‌গে, হাতপা ভেঙে বিকল হওয়ার মতন হয়ে থাকি—যদি এ করেও রেহাই পাই। (লাঠি ভর করে দাঁড়িয়ে রইল)

(যেমন বলা হয়েছে, সেইরকম সঙ্গী নিয়ে রাজার প্রবেশ)

রাজা—(আত্মগত)—

প্রিয়াকে পাওয়া সহজ নয় সত্যি ; কিন্তু মন
তার অনুরাগের লক্ষণ দেখে আশ্বাস পেয়েছে।
ভালবাসা কৃতার্থ হয়নি, তবু দুজনের দুজনকে
চাওয়ায় আনন্দ।

(হেসে) মন যাকে চায়, নিজের মনের ইচ্ছা দিয়ে তার *মনের ভাব অনুমান করে এমনি ভাবে প্রেমিকের বিড়ম্বনা* হয়।—

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়েও সে যে অনুরাগের
দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ; পিছনটা ভারী বলে আস্তে
যাচ্ছিল—যেন বিলাসগমন ; যাস না বলে বাধা
দেওয়ায় এই যে সখীর উপরে রাগ করেছে—
সেসব আমার জন্যে—আহা, প্রেমিক নিজের
মনের মতই দেখে।

বিদূষক—(যেমন ছিল সেই ভাবেই) বন্ধু, আমার হাত পা চলছে না। শুধু কথা দিয়েই আপনার জয় উচ্চারণ করছি। জয় হোক, জয় হোক আপনার।

রাজা—শরীর অবশ হল কি করে ?

বিদূষক—কেন ? নিজে চোখে খোঁচা দিয়ে চোখের জলের কারণ জিজ্ঞাসা করছেন ?

রাজা—সত্যিই বুঝতে পারছি না।

বিদূষক—বন্ধু, বেত যে বেঁকে যায় সে কি নিজে নিজে, না নদীর স্রোতে ?

রাজা—নদীর স্রোতই তার কারণ।

বিদূষক—আমারও আপনি।

রাজা—কি করে ?

বিদূষক—এমনি করে রাজকার্য ছেড়ে এইরকম ভীষণ জায়গায় আপনি বনচর হয়েছেন যে, সত্যি রোজ হিংস্র জানোয়ারের পিছনে

ছুটোছুটি করে গিয়ে গাঁট সব ফুলে আমার শরীর আর আমার নেই। তাই আমাকে দয়া করুন, একদিনও বিশ্রাম করুন।

রাজা—(স্বগত) এও এইরকম বলছে। কাশ্যপের মেয়ের কথা ভেবে আমারও মন শিকার চাইছে না।

কেননা—

হরিণরা প্রিয়ার সঙ্গে থাকতে পেয়ে যেন তাকে
এমন মধুর চাউনি শিখিয়েছে—ছিলা পরাণো বাণ
জোড়া ধনুক হারণদের উপর নোয়াতে পারছিনা।

বিদূষক—(রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে) আপনি কি একটা মনে মনে ভাবছেন, আমার হল অরণ্যেরোদন।

রাজা—(মৃদু হেসে) কি আর! বন্ধুর কথা ফেলা উচিত নয়, তাই রয়ে গেলাম।

বিদূষক—(খুশি হয়ে) অনেক দিন বেঁচে থাকুন (উঠতে ইচ্ছা করে)

রাজা—বন্ধু দাঁড়াও। আমার কথা বাকি আছে।

বিদূষক—আদেশ করুন আপনি।

রাজা—বিশ্রাম করে তোমাকেও আমার একটা কাজে সহায় হতে হবে। কাজটায় পরিশ্রম অল্প।

বিদূষক—কি মিঠাই খেতে ? তাহলে এই লোক ভালই বাছা হয়েছে।

রাজা—কোথায় বলছি। কে, কে আছ এখানে।

(প্রবেশ করে)

দৌবারিক—(প্রণাম করে) আদেশ করুন প্রভু।

রাজা—রৈবতক, সেনাপতিকে ডাক।

দৌবারিক—যে আজ্ঞে। (বেরিয়ে গিয়ে সেনাপতির সঙ্গে আবার ঢুকে) এই যে প্রভু আদেশ করতে উৎসুক হয়ে এদিকে তাকিয়েই আছেন। আর্য, কাজে যান।

সেনাপতি—(রাজাকে দেখে) শিকারে দোষ আছে, তবুও শিকার প্রভুর শুধু ভালই করেছে।

কারণ প্রভুর—

রাজা—(

বিশাল বলে নজরে পড়েনা। পাহাড়ে চরে
বেড়ানো হাতীর মতন শরীরের সারটুকুই আছে।

(কাছে এসে) প্রভুর জয় হোক। জঙ্গলের জন্তুদের তাড়িয়ে আনা হয়েছে। অন্যজায়গায় অপেক্ষা করছেন কেন?

রাজা—শিকারের নিন্দা করে মাধব্য আমার উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছে।

সেনাপতি—(জনান্তিকে) বন্ধু, তুমি বাধা দিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ প্রভুর মন জুগিয়ে চলি। (প্রকাশ্যে) এ বোকা বাজে কথা বলছে। প্রভুই প্রমাণ—

মিথ্যেই একে ব্যসন বলা হয়। এতে মেদ
কমে যেয়ে শরীর হাল্কা হয়। কাজের উপযুক্ত
হয়। রাগে আর ভয়ে জন্তুদের কিরকম
বিকৃতি হয় তাও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। চলে
বেড়ানো লক্ষ্যে যে বাণ মারতে পারে সেই
ধনুকধারীদের সেরা। এরকম আনন্দ কোথায়?

বিদূষক—(রেগে) উৎসাহদেনেওয়ালা দূর হও। উনি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছেন। তুমি বনে বনে ঘুরে ঘুরে, মানুষের নাকে লোভ করে, এইরকম কোন একটা বুড় ভাল্লুকের মুখে পড়।

রাজা—সেনাপতি মশাই, আমরা আশ্রমের কাছে রয়েছি। সেই জন্যে আপনার কথা মানতে পারছিনা। আজ তাহলে—

মোষেরা শিঙ্ দিয়ে বার বার জল ঘোলা
করে ডোবায় স্নান করুক, হরিণেরা দল
বেঁধে গাছের ছায়ায় জাবর কাটা অভ্যাস করুক।
বরাহরা পুকুরে মুথো ঘাস খাক, আর আমার ছিলা
খোলা এই শিথিল ধনুকও বিশ্রাম করুক।

সেনাপতি—প্রভুর যা ইচ্ছা।

[illegible]াহলে বন ঘেরাও করতে আগে যারা বেরিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আন। আমার সৈন্যরা যাতে তপোবনে কোনরকম অত্যাচার না করে সেইভাবে নিষেধ করে দিও। দেখ—

শান্তিপূর্ণ তপোধনদের ভিতরে জ্বালিয়ে দিতে
পারে এই রকম তেজ লুকিয়ে আছে। সূর্যকান্ত
মণি ছোঁয়া যায় কিন্তু অন্য তেজকে হারিয়ে
দেবার জন্যে তেজ ঠিকরে বেরোয়।

সেনাপতি—প্রভুর যা আদেশ।

বিদূষক—তোমার উৎসাহের বুলি ধ্বংস হোক।

(সেনাপতি বেরিয়ে যায়)

রাজা—(পরিজনদের দিকে তাকিয়ে) তোমাদের শিকারের পোষাক ছেড়ে ফেল। রৈবতক, তুমিও নিজের কাজে যাও।

পরিজন—প্রভুর যা আদেশ (বেরিয়ে যায়)

বিদূষক—মাছিটিও আপনি তাড়িয়েছেন। এখন এই গাছের ছায়া দিয়ে বানানো সামিয়ানার নীচে পাথরের উপরে বসুন। আমিও আরাম করে বসি।

রাজা—এগিয়ে যাও।

বিদূষক—আপনি আসুন—

(দুজনে হেঁটে এসে বসলেন)

রাজা—মাধব্য, দেখার জিনিস তুমি দেখনি। তোমার দৃষ্টি বৃথা।

বিদূষক—আপনিইত' আমার সামনে আছেন।

রাজা—প্রিয়জনকে সবাই সুন্দর দেখে। আমি কিন্তু সেই শকুন্তলার কথা বলছি—সে আশ্রমের অলংকারের মতন।

বিদূষক—(স্বগত) হোক, আমি এঁকে সুযোগ দিচ্ছি না। (প্রকাশ্যে) বন্ধু, আপনি তপস্বীর মেয়ে চাইছেন দেখছি।

রাজা—বন্ধু, যা না চাওয়া উচিত পুরুবংশের লোকের মন তা চায় না।—

মুনির মেয়ে আসলে স্বর্গের তরুণীর মেয়ে।

সে ছেড়ে গিয়েছে ; মুনি পেয়েছে। এ যেন
আকন্দের উপরে নবমল্লিকা ঝরে পড়েছে।

বিদূষক—(হেসে) যেমন কারো কারো পিণ্ডিখেজুর খেয়ে অরুচি হলে তেঁতুল খেতে ইচ্ছে হয়, সেইরকম সেরা স্ত্রীলোকদের ভোগ করার পর আপনার এখন এইরকম ইচ্ছে।

রাজা—তুমিত' এঁকে দেখছ না, তাইতে এইরকম বললে।

বিদূষক—যাতে আপনিও মোহিত হয়েছেন তা নিশ্চয়ই সুন্দর।

রাজা—বন্ধু, বেশি কি—

আমার মনে হয় সে বিধাতার সৃষ্টি দ্বিতীয় স্ত্রী
রত্ন। তার তনু আর বিধাতার সামর্থ্য ভেবে মনে
হয়, হয়ত আগে ছবিতে এঁকে পরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা
করেছেন, হয়ত মনে মনে সব রূপ চয়ন করে
তাকে সৃষ্টি করেছেন।

বিদূষক—যদি তাই হয় তাহলে এতদিনে রূপসীদের নাম ঘুচল।

রাজা—আমারও তাই মনে হয়—

সে যেন না শোঁকা ফুল, যেন নখের আঁচরও
লাগেনি এমনি নতুন পল্লব, যেন না গাঁথা রত্ন।
যেন নতুন মধু, কেউ স্বাদ নেয়নি, অখণ্ড
পুণ্যের ফলের মতন নিখুঁত। জানিনা কার
ভোগের জন্য বিধাতা একে সৃষ্টি করেছেন।

বিদূষক—তা হলে আপনি এঁকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করুন, না হলে হয়ত ইঙ্গুদী তেলে পালিশকরা মাথা কোন তপস্বীর হাতে পড়বেন।

রাজা—উনি পরের অধীন। গুরুজনও এখানে কাছাকাছি নেই।

বিদূষক—তাঁর চোখে আপনার উপর কিরকম অনুরাগ ?

রাজা—ঋষি কন্যাদের স্বভাব ত' প্রগলভ নয়, তবুও কিন্তু—

আমার দিকে হলে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে,
হেসেছে যেন অন্য কারণে। বিনয়ে তার মনের

করেনি, ঢেকেও রাখেনি।

বিদূষক—আপনাকে দেখেই কি কোলে উঠে বসেনি ?

রাজা—আমাদের ছাড়াছাড়ির সময় শালীনতা সত্ত্বেও তার মনের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কেননা—

কুশের অঙ্কুরে পা কেটে গিয়েছে—এই অজুহাতে
কয়েক পা যেয়ে সে তন্বী দাঁড়িয়ে পড়ল।
গাছের ডালে বল্কল আটকায়নি, তবুও মুখ
ঘুরিয়ে বল্কল ছাড়াতে লাগল।

বিদূষক—তাহলে পাথেয় নিয়ে নিন, আপনি ত' দেখছি তপোবনকে উপবন বানিয়ে দিলেন।

রাজা—বন্ধু, কোন কোন তপস্বী আমাকে চিনে ফেলেছে। তাহলে ভাব কি অজুহাতে অন্তত একবার আশ্রমে যেতে পারি।

বিদূষক—আপনাদের রাজাদের আবার অন্য কি ওজরের দরকার ? নীবার ধানের ছ'ভাগের এক ভাগ দাও—
এই ত' ওজর।

রাজা—মূর্খ, এদের রক্ষা করে আমরা অন্যরকম খাজনা পাই, যে জন্যে রত্নের রাশি ফেলেও সে জিনিস পেতে ইচ্ছে হয়। দেখ—

অন্যান্য বর্ণের কাছ থেকে রাজারা যা পান তার
ক্ষয় আছে, এই আরণ্যকদের কাছ থেকে যে
তপস্যার ছ'ভাগের এক ভাগ পান তার ক্ষয়
নিশ্চয়ই নেই।

(নেপথ্যে)

বাঃ, আমাদের কার্য সিদ্ধি হয়েছে।

রাজা—(কান দিয়ে) ধীর প্রশান্তস্বর এঁরা তপস্বীই হবেন।

(প্রবেশ করে)

দৌবারিক—জয় হোক, জয় হোক প্রভু। দু'জন ঋষিকুমার দরজায় এসেছেন।

রাজা—তাঁদের দু'জনকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।

দৌবারিক—এই নিয়ে আসছি। (বেরিয়ে যেয়ে ঋষিকুমারদের নিয়ে প্রবেশ করে) এদিকে, এদিকে আসুন আপনারা।

দুজনে—(রাজাকে দেখতে দেখতে)

প্রথম—আহা, তেজস্বী হলেও এঁকে দেখলে ভরসা হয়। নাকি, এই রাজাকে ঋষিদের মতনই মনে হয়। কেননা—

উনিও সবাই ভোগ করতে পারে এমন আশ্রম
অধিকার করে থাকেন। রক্ষা করেন বলে উনিও
রোজই তপসঞ্চয় করেন। ওঁর সম্বন্ধেও চারণ
দুজনে গান করে, তা আকাশ ছোঁয়, সে গানে
পুণ্যশব্দ ঋষি বার বার বলা হয়—কেবল তার
আগে রাজা থাকে।

দ্বিতীয়—গৌতম ইনিই ইন্দ্রের বন্ধু দুষ্যন্ত?

প্রথম—হ্যাঁ।

দ্বিতীয়—

ওঁর হাত নগরের দরজার আগলের মতন বিশাল,
যুদ্ধের সময় দৈত্যদের সঙ্গে শত্রুতায় দেবতাদের
ওঁর ছিলা পরাণো ধনুক আর ইন্দ্রের বজ্রেই
ভরসা। উনি একা যে নীলসমুদ্রে ঘেরা পৃথিবী
ভোগ করবেন এতে বিচিত্র কিছু নেই।

দুজনে—(কাছে এসে) জয় হোক রাজা।

রাজা—(আসন থেকে উঠে) আপনাদের দুজনকে অভিবাদন করি।

দুজনে—আপনার মঙ্গল হোক (ফল উপহার দিলেন)

রাজা—(প্রণাম করে গ্রহণ করে) আদেশ চাইছি।

দুজনে—আপনি যে এখানে আছেন তা আশ্রমবাসীরা জেনেছে, তাইতে আপনার কাছে প্রার্থনা করছেন।

রাজা—কি আদেশ?

দুজনে—মাননীয় মহর্ষি কণ্ব কাছে না থাকাতে রাক্ষসেরা আমাদের

যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করছে। তাইতে কয়েক রাত্রি সারথি নিয়ে আপনি আশ্রমের অভিভাবক হোন।

রাজা—আমি অনুগৃহীত হলাম।

বিদূষক—(জনান্তিকে) এঁদের এই অনুরোধে এখন আপনার সুবিধা।

রাজা—(হেসে) রৈবতক, আমার নাম করে সারথিকে বল, ধনুক-বাণ আর রথ নিয়ে আসুক।

দৌবারিক—প্রভুর যা আদেশ। (বেরিয়ে যায়)

দুজনে—(আনন্দিত হয়ে)

পুরুবংশের লোকেরা বিপন্নদের রক্ষা করার
ধর্মেই দীক্ষিত। পূর্বপুরুষদের মতন কাজ, এ
আপনার যোগ্য।

রাজা—(প্রণাম করে) আপনারা আগে যান। আমিও আপনাদের পিছন পিছনই আসছি।

দুজনে—জয় হোক। (বেরিয়ে যায়)

রাজা—মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখার কৌতূহল আছে ?

বিদূষক—প্রথমে পুরোপুরিই ছিল। কিন্তু এখন রাক্ষসের কথা শুনে একফোঁটাও নেই।

রাজা—ভয় পেয়োনা, তুমি আমার কাছেই থাকবে।

বিদূষক—এই, আমি রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

(প্রবেশ করে)

দৌবারিক—রথ তৈরি। প্রভুর জয়যাত্রার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখন আবার নগর থেকে দেবীর আজ্ঞা নিয়ে করভক এসেছে।

রাজা—(সাদরে) কি, মা পাঠিয়েছেন ?

দৌবারিক—হ্যাঁ।

রাজা—নিয়ে এস।

দৌবারিক—যে আজ্ঞে (বেরিয়ে করভককে নিয়ে প্রবেশ করে) এই যে প্রভু। কাছে যাও।

করভক—জয় হোক, জয় হোক প্রভু। দেবী আদেশ করেছেন,

'আজ থেকে চতুর্থ দিনে পুত্রপিণ্ড পালনের উপোস আছে।
সেদিন আয়ুষ্মাণের উপস্থিতি আমাদের অবশ্য কাম্য।'

রাজা—একদিকে গুরুজনদের আদেশ, একদিকে তপস্বীদের কাজ।
দুটোই ফেলার মতন নয়। এখানে প্রতিকার কি?

বিদূষক—ত্রিশঙ্কুর মতন মাঝখানে থাকুন।

রাজা—সত্যি মুস্কিলে পড়েছি।

দুটো কাজ আলাদা জায়গায়, তাইতে সামনে
পাহাড়ে ঠেকে নদীর স্রোত যেরকম দুভাগ হয়ে
যায়, সেই রকম আমার মন দুভাগ হয়ে যাচ্ছে।

(ভেবে) বন্ধু, তোমাকে মা ছেলের মতনই নিয়েছেন, তাইতে এখান
থেকে ফিরে আমি তপস্বীদের কাজে ব্যস্ত এই কথা বলে তুমি
মাননীয়া তাঁর ছেলের কাজ করতে পার।

বিদূষক—আমি রাক্ষসের ভয় পাই ভাববেন না।

রাজা—(হেসে) তোমার পক্ষে এ কি করে সম্ভব?

বিদূষক—রাজার ছোট ভাই যেভাবে যায়, সেইভাবে যাব।

রাজা—তপোবনের অসুবিধা বন্ধ করা উচিত, সেই জন্যে সঙ্গের সব
লোকজনকেই তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিদূষক—(সগর্ব্বে) তাহলে আমি এখন যুবরাজ হয়ে গেলাম।

রাজা—(নিজের মনে) চঞ্চল ব্রাহ্মণ। আমি কি চাই তাই হয়ত কখন
বাড়ীর ভিতরে বলে বসবে। যা হোক, ওকে এই রকম বলি।
(বিদূষকের হাত ধরে প্রকাশ্যে) বন্ধু, ঋষিদের মান রাখতে আশ্রমে
যাচ্ছি। মুনির মেয়ের সম্বন্ধে আমার অভিলাষ সত্যি নয়। দেখ—

কোথায় আমরা আর কোথায় প্রেমের ব্যাপার
না জানা মানুষ, যে হরিণছানাদের সাথে বড়
হয়েছে। বন্ধু, পরিহাস করে যে কথা বলেছি,
তা সত্যি বলে নিওনা।

বিদূষক—ঠিক।

(সবাই বেরিয়ে যায়)

তৃতীয় অঙ্ক

বিষ্কম্ভক

(তারপর যজমান শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য—(কুশ নিয়ে) ওঃ, রাজা দুষ্মন্তের বিরাট প্রভাব, তিনি ঢোকামাত্রই আমাদের কাজকর্মের উপর উপদ্রব চলে গিয়েছে।—

বাণ মারার কথা থাক, দূর থেকে ধনুকের টঙ্কারে
আর হুঙ্কারেই সব বাধা পালিয়ে যায়।

এখন এই কুশ বেদিতে বিছিয়ে দেবার জন্য ঋত্বিকদের দেব। (খানিকটা যেয়ে দেখে আকাশে)—প্রিয়ংবদা, কার জন্যে এই উশীর প্রলেপ আর ডাঁটা শুদ্ধ পদ্মপাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? (শোনার অভিনয় করে) কি বলছ? রোদ লেগে শকুন্তলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে? তার শরীর ঠাণ্ডা করার জন্যে? প্রিয়ংবদা, তা হলে ভাল করে শুশ্রূষা করো। মাননীয় কুলপতির সে একেবারে প্রাণ। আমিও ওর জন্যে বৈতানিকের শান্তিজল গৌতমীর হাতে পাঠিয়ে দেব। (বেরিয়ে যায়)

বিষ্কম্ভক শেষ

(তারপর প্রেমে বিচলিত রাজার প্রবেশ)

রাজা—(নিশ্বাস ফেলে)—

তপস্যার ক্ষমতা জানি। সে মেয়ে পরাধীন তা
আমার জানা; তবু এই মনকে ওদিক থেকে
ফেরাতে পারি না।

(প্রেমের ব্যথা দেখিয়ে) ভগবান্ পুষ্পধনু। তোমাকে আর চাঁদকে প্রেমিকরা বিশ্বাস করে, তোমরা প্রেমিকের স্বার্থ বঞ্চনা কর।—

[illegible] লোকের কাছে এই দুয়ের অর্থ
ভুল মনে হয়। চাঁদের ঠাণ্ডা আলো আগুন ছড়ায়,
আর তুমিও ফুলের বাণকে বাজের মতন হানো।

মকরকেতন যদি অনবরতই আমার মনকে ব্যথা দিতে থাকেন, তাও আমার ভাল, যদি সে ব্যথা মদিরনয়না তার জন্যে হয়।

(দুঃখের সাথে ঘুরতে ঘুরতে) কাজ শেষ হল, ঋষিরা বিদায় দিলেন, দুঃখী আমি আনন্দ পাই কি করে। (নিশ্বাস ফেলে) প্রিয়াকে দেখা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ওকে খুঁজি (সূর্য দেখে) এইরকম প্রখর রৌদ্রের সময় শকুন্তলা প্রায়ই লতায় ঘেরা মালিনীর পারে সখীদের নিয়ে যায়। সেখানেই যাই। (যেয়ে দেখে) ওই ছোট ছোট গাছের সারের পাশ দিয়ে একটু আগেই সুতনু গিয়েছে বলে মনে হয়। কারণ—

এই ছেঁড়া কচি পাতাগুলো রসে ভেজা দেখাচ্ছে,
আর সে ফুল তুলেছে, বৃন্ত এখনো বোজেনি।

(ছোঁয়ার অভিনয় করে) আঃ, হাওয়ায় জায়গাটা মিষ্টি।

মালিনীর ঢেউয়ের কণা বয়ে আনা পদ্মের গন্ধে
ভরা এই হাওয়াকে প্রেমে তপ্ত অঙ্গ দিয়ে
একবারও না ছেড়ে জড়িয়ে ধরতে পারি।

(ঘুরে দেখে) এই বেতগাছে ঘেরা লতার কুঞ্জে শকুন্তলা কাছেই হবে, কারণ—

ওই দরজায় হলদে বালিতে তাজা পায়ের ছাপ
দেখা যায়, পিছনটা ভারি বলে পায়ের ছাপের
পিছনটা গভীর, সামনেটা উঁচু।

গাছের আড়াল থেকে দেখি।

(হেঁটে তাই করে আনন্দের সাথে) আঃ পেয়েছি, চোখ জুড়িয়ে যায়। এই আমার মনের প্রিয়া ফুল ছড়ানো পাথরে শুয়ে

আছে। সখীরা সেবা করছে। বেশ, ওদের মনখোলা আলাপ শুনি।

(এই বলে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন)

(তারপর যেরকম বর্ণনা করা হয়েছে, সেইভাবে সখীদের নিয়ে শকুন্তলার প্রবেশ।)

সখীরা—(আদর করে হাওয়া করতে করতে) ওলো শকুন্তলা, পদ্মপাতার হাওয়া তোর ভাল লাগছে ?

শকুন্তলা—(দুঃখের সাথে) কি ? সখীরা আমাকে হাওয়া করছিস ?

(সখীরা দুঃখের অভিনয় করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে)

রাজা—শকুন্তলাকে বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছে। ওর কি রোদ লেগেছে, না আমার যা মনে হয় তাই ? (সস্পৃহ চোখে দেখে) *সন্দেহে কাজ কি ?—*

অসুস্থ প্রিয়ার স্তনে উশীর, হাতের মৃণালের বালা
শিথিল হয়েছে, সত্যিই কি সুন্দর এই তনু।
গ্রীষ্মে আর প্রণয়ে সমান তাপ সত্যি, কিন্তু
তরুণীতে গ্রীষ্মের অপরাধ এত মধুর নয়।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকে) অনসূয়া, সেই রাজর্ষিকে প্রথম দেখা থেকেই শকুন্তলা আনচান করছে। সেই জন্যেই শকুন্তলার এই অসুখ হয়নি ত ?

অনসূয়া—সখি ; আমার মনেও সেই রকম আশঙ্কা, ঠিক ওকে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) সখি তোর কাছে কিছু প্রশ্নও আছে। অসুখটা তোর বেশি।

শকুন্তলা—(কোমর পর্যন্ত বিছানা থেকে উঠিয়ে) ওলো, কি বলতে চাইছিস ?

অনসূয়া—ওলো শকুন্তলা, প্রেমের ব্যাপারে আমরা নেই, কিন্তু, ইতিহাসের গল্পে প্রেমিকদের অবস্থা যেরকম শোনা যায় তোকেও সেই রকম দেখছি। বল, কি তোর অসুখ ? অসুখের সত্যিকারের কারণ না জানলে প্রতিকার হয় না।

রাজা—আমি যা ভাবছি অনসূয়াও তেমনি। নিজের আকাঙ্ক্ষার জন্যেই আমি দেখছি তা নয়।

শকুন্তলা—(নিজের মনে) আমার উৎকণ্ঠা বড় বেশি। এখনও হঠাৎ এদের বলতে পারছি না।

প্রিয়ংবদা—সখি ভালই বলেছে। নিজের অসুখকে কেন অবহেলা করছিস? দিন দিন তোর শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। কেবল তোর লাবণ্যেভরা ছায়া তোকে ছেড়ে যায়নি।

রাজা—প্রিয়ংবদা মিথ্যে বলেনি, কারণ—

মুখে গাল দুটো শুকিয়ে গিয়েছে, বুকে স্তন
শিথিল হয়েছে; কোমরটা আরও সরু, কাঁধ
দুটো অনেকটা ঝুলে পড়েছে, শরীরটা ফ্যাকাশে,
প্রেমেকাতর হয়ে করুণও দেখাচ্ছে, সুন্দরও
দেখাচ্ছে। যেন পাতা শুকিয়ে নেয়া হাওয়ায়
ছোঁয়া মাধবীলতা।

শকুন্তলা—(নিশ্বাস ফেলে) সখি, আর কাকেইবা বলব। কিন্তু আমি এখন তোদের অসুবিধার কারণ হব।

দুজনে—সেই জন্যেই জোর করা। যারা ভালবাসে তাদের ভাগ দিলেই দুঃখ সহ্য করা যায়।

রাজা—

সুখ-দুঃখের ভাগ সমান ভাবে নেয় এমন মানুষ
জিজ্ঞাস করলে মনের দুঃখের কারণ এ মেয়ে
বলবে না তা নয়। বহু বার ঘুরে ও আমাকে
সতৃষ্ণ ভাবে দেখা সত্ত্বেও এখন আমার শুনতে
ভয় করছে।

শকুন্তলা—তপোবন রক্ষা করতে এসে ওই রাজর্ষি যখন থেকে আমার চোখে পড়েছেন (অর্ধেক বলে লজ্জার অভিনয়)

দুজনে—বল, বল প্রিয়সখী।

শকুন্তলা—তখন থেকে তাঁতেই আমার অভিলাষ যাওয়াতে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি।

রাজা—(আনন্দে) যা শোনার তা শুনেছি।—

জীবলোকের কাছে গ্রীষ্মের শেষে মেঘে ঢাকা
মলিন দিনের মতন ভালবাসাই আমাকে তাপ
দিয়েছে, আবার তাপ নিবিয়েছেও।

শকুন্তলা—যদি তোমাদের মত হয় তাহলে এমন কর যাতে সেই রাজর্ষির আমার উপরে অনুকম্পা হয়, তা নাহলে আমার তিলাঞ্জলিই হবে।

রাজা—সন্দেহ না থাকার মতন কথা।

প্রিয়ংবদা—(জনান্তিকে) অনসূয়া, ভালবাসায় অনেক দূর এগিয়ে ও আর সময় নষ্ট করতে পারে না। যাকে ও মন দিয়েছে সে পুরুবংশের গৌরব। সেই জন্যে ওর অভিলাষকে অভিনন্দন জানানো উচিত।

অনসূয়া—যা বলছিস ঠিকই।

প্রিয়ংবদা—(প্রকাশ্যে) কপালগুণে আকাঙ্ক্ষা তোর উপযুক্ত। সাগর ছাড়া মহানদী আর কোথায় যায়। নতুন পাতায় ভরা মাধবীলতা আমগাছ ছাড়া আর কাকে জড়াবে ?

রাজা—দুটি বিশাখা যে চাঁদের কলার পিছনে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

অনসূয়া—কিন্তু কি উপায় করা যায় যাতে সখীর মনের আশা গোপনে, অথচ তাড়াতাড়ি পূর্ণ করতে পারব ?

প্রিয়ংবদা—তাড়াতাড়িটা সহজ, গোপনের কথাটাই ভাববার।

অনসূয়া—কি করে ?

প্রিয়ংবদা—রাজর্ষির ওর দিকে দৃষ্টি মধুর, তাতে ভালবাসা মনে হয়। ইদানীং জেগে থাকাতে ওঁকে রোগা দেখায়।

রাজা—(নিজেকে দেখে) সত্যি, আমি তাই হয়েছি।

কারণ—

রাতেরপর রাত, হাতের উপর রাখা চোখের
কোন থেকে মনের তাপে উষ্ণ জল গড়িয়ে
পড়ে মণিগুলো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, এই
সোনার বালা বারে বারে মনিবন্ধ থেকে সরে
যায় ; ছিলার কড়া না ছুঁইয়েই আমি বারে
বারে উঠিয়ে দেই।

প্রিয়ংবদা—(চিন্তা করে) ওরে আমরা ওঁকে একটা প্রেমপত্র লিখি, যেন দেবতার নির্মাল্য, এইভাবে ওটা ফুলের ভিতরে লুকিয়ে ওঁর হাতে পোঁছে দেব।

অনসূয়া—উপায়টা সুন্দর, আমার ভাল লাগছে। শকুন্তলা কি বলে ?

শকুন্তলা—তোদের দেয়া কোন বুদ্ধি অন্যরকম করি ?

প্রিয়ংবদা—তাহলে নিজেকে নিয়ে কোন মিষ্টি কথার মালা ভাব।

শকুন্তলা—ভাবছি, পাছে ফিরিয়ে দেয় সেই ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

রাজা—(আনন্দিত হয়ে)—

ভীতু মেয়ে—যে তোমাকে ফিরিয়ে দেবে বলে
ভয় পাচ্ছ, সে এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে
মিলনের আশায় উৎসুক হয়ে। যে চায়—সে
শ্রী পেতে পারে, নাও পেতে পারে, শ্রী যাকে
চায় তাকে পাওয়া কঠিন হবে কি করে ?

সখীরা—ওরে নিজের গুণকে অপমান করা মেয়ে, শরৎকালের শরীর জুড়োনো চাঁদের আলোকে কাপড় দিয়ে কে আড়াল করে ?

শকুন্তলা—(হেসে) এখন সুরু করলাম, (বসে ভাবতে থাকে)

রাজা—পলক না ফেলা চোখে প্রিয়াকে দেখছি—দেখারই মতন।—

মুখের একদিকের লতার মতন ভ্রূ উঁচু করে পদ
রচনায় ব্যস্ত ; ওর রোমাঞ্চিত গাল আমাতে
অনুরাগ প্রকাশ করছে।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাসহ মহর্ষি কণ্ব

খড়িপাথরে তৈরী শকুন্তলা

শিল্পী : ভুবন মহাপাত্র
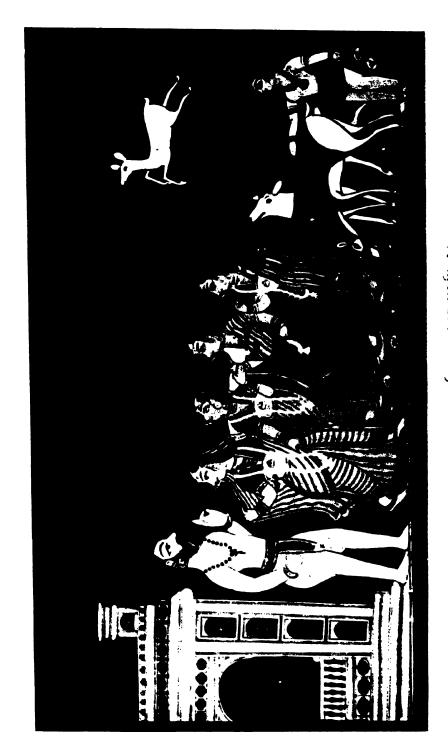
শকুন্তলা—ওরে গানের পদ ভেবেছি কিন্তু লেখার জিনিসপত্র কাছে নেই।

প্রিয়ংবদা—এই শুকপাখীর পেটের মত নরম পদ্মপাতায় নখ দিয়ে আঁচড়ে অক্ষরগুলো লেখ।

শকুন্তলা—(যা বলা হয়েছে সেই রকম অভিনয় করে) এখন শোন, কোন মানে হয়েছে, না হয়নি।

দুজনে—আমরা শুনছি।

শকুন্তলা—(পড়তে থাকে)—

ওগো নিষ্ঠুর, তোমার মন জানি না, কিন্তু
তোমাকে ঘিরে আমার মনের বাসনা। প্রেম
আমার-প্রতি অঙ্গকে দিন-রাত বড়ই তপ্ত
করছে।

রাজা—(হঠাৎ সামনে এসে)—

তম্বী মেয়ে! প্রেম তোমাকে তপ্ত করছে কিন্তু
আমি যেন দিনরাত জ্বলছি। দিন চাঁদকে
যেরকম ম্লান করে পদ্মকে তেমন করে না।

সখীরা—(দেখে আনন্দে উঠে) মনের বাসনা দেরি করেনি, তাকে স্বাগত। (শকুন্তলা উঠতে চেষ্টা করে)

রাজা—না না, কষ্ট করতে হবে না।—

ফুলের বিছানায়ও কাতর তোমার তনু, তাড়া-
তাড়িতে তোমার মৃণালের বালা থেঁৎলানো,
তোমার এমন কঠিন ব্যথায় কাতর দেহে
লৌকিকতা উচিত নয়।

অনসূয়া—বন্ধু, এই পাথরের একপাশের আভরণ হোন আপনি।

(রাজা বসেন)

(শকুন্তলার লজ্জা করতে থাকে, সে বসে থাকে।)

প্রিয়ংবদা—আপনাদের দুজনের দুজনের উপর ভালবাসা দেখা যাচ্ছে। বন্ধুর উপরে আমার ভালবাসা আমাকে একটু বেশি কথা বলাচ্ছে।

রাজা—ভদ্রে, এ না বলা ঠিক নয়। বলার কথা না বললেই অনুতাপের সৃষ্টি করে।

প্রিয়ংবদা—রাজাদের কাজ রাজ্যে বিপন্নদের দুঃখ দূর করা। এই আপনাদের ধর্ম ?

রাজা—এর চাইতে বড় কিছু নেই।

প্রিয়ংবদা—আমাদের এই বন্ধুকে আপনার জন্যেই সর্বশক্তিমান প্রেমের দেবতা এই অবস্থায় এনে ফেলেছেন। সেই জন্যে অনুগ্রহ করে ওর জীবন বাঁচানো আপনার কর্তব্য।

রাজা—ভদ্রে, এ ভালবাসা দুজনেরই, সব দিক দিয়েই অনুগৃহীত হয়েছি।

শকুন্তলা—(প্রিয়ংবদার দিকে তাকিয়ে) ওলো, বাড়ীর মেয়েদের ছেড়ে এসে রাজর্ষির মন খারাপ, অনুরোধ করে কি হবে ?

রাজা—

আমার মনের কাছ ঘেঁষে তুমি আছ। মদির
তোমার চোখ। আমার মনে অন্য আর কেউ
নেই। এ মনকে যদি অন্য আর কিছু ভাব তা
হলে প্রেমে আমি মরেই আছি—আবার মরব।

অনসূয়া—বন্ধু, শোনা যায় রাজাদের অনেক স্ত্রী থাকে। এমন করবেন যাতে আমাদের প্রিয়সখীর জন্যে বন্ধুদের কোন দুঃখ করতে না হয়।

রাজা—ভদ্রে, বেশি কি বলব।—

অনেক স্ত্রী থাকলেও আমার বংশের নির্ভর
দুটো—আপনাদের এই সখী আর সমুদ্রে ঘেরা
পৃথিবী।

দুজনে—আমরা খুশি হয়েছি। (শকুন্তলা আনন্দ প্রকাশ করে)

প্রিয়ংবদা—(তাকিয়ে) অনসূয়া, এই যে হরিণের ছানা এদিকে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে আছে, মাকে খুঁজছে, ওকে দিয়ে আসি।

(দুজনে চলে যায়)

শকুন্তলা—ওলো, আমাকে দেখবার কেউ রইল না, তোদের একজন কেউ আয়।

দুজনে—(হেসে) পৃথিবীকে যিনি দেখেন তিনি তোর কাছে।

(দুজনে বেরিয়ে যায়)

শকুন্তলা—কিরকম। দুজনে চলেই গেল।

রাজা—সুন্দরী ভেবোনা। তোমাকে যে পূজো করে সে তোমার পাশে। তাই বল—

উরু হাতের মুঠোয় ধরা যায় মেয়ে, ক্লান্তি দূর
করা, জলে ভেজা পদ্মপাতার পাখায় হাওয়া করব
কি? না পদ্মের মত লাল পা কোলে নিয়ে
তোমার যে রকম ভাল লাগে সেবা করব?

শকুন্তলা—যাঁরা মাননীয় তাঁদের কাছে নিজেকে অপরাধী করব না।

(উঠে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে)

রাজা—(ধরে) সুন্দরি, দিন এখনও নেভেনি, তোমারও এইরকম একই অবস্থা।—

ফুলের বিছানা আর পদ্মপাতা দিয়ে বানানো
তোমার স্তনের আবরণ ছেড়ে অসুস্থ নরম শরীর
নিয়ে কি করে রোদে যাবে?

(জোর করে ওকে নিবৃত্ত করলেন)

শকুন্তলা—পুরুবংশের গৌরব, ভদ্রতা রক্ষা করো। ভালবাসায় কাতর হলেও আমি স্বাধীন নই।

রাজা—ভীতু মেয়ে, গুরুজনের ভয় করো না। মাননীয় কুলপতি সব ধর্মই জানেন, তিনি যখন জান্‌তে পারবেন তখন কোন দোষ নেবেন না। তা ছাড়া—

শোনা যায়, অনেক রাজর্ষির মেয়েরা গন্ধর্ব
বিয়ে করেছেন আর তাদের বাবা-মায়েরা তাদের
অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শকুন্তলা—আমাকে ছেড়ে দাও। আবার সখীদের অনুমতি নেব।

রাজা—বেশ, ছেড়ে দেব।

শকুন্তলা—কখন?

রাজা—

সুন্দরি, যখন নতুন ফোটা ফুলে মৌমাছির মতন
তোমার অক্ষত কোমল অধরের রস তৃষ্ণার্ত আমি
দরদ ভ'রে গ্রহণ করব।

(মুখ তুলে ধরবার চেষ্টা করে, শকুন্তলা বাধা দেবার অভিনয় করে।)

(নেপথ্যে)—চক্রবাক বধূ, সাথীকে বিদায় জানাও, রাত হয়ে এল।

শকুন্তলা—(কান দিয়ে সসম্ভ্রমে) পৌরব, আর্যা গৌতমী আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে এদিকেই আসছেন সন্দেহ নেই। ততক্ষণ তুমি গাছের আড়ালে যাও।

রাজা—বেশ। (লুকিয়ে থাকেন)

(তারপর পাত্র হাতে গৌতমী আর সখীদের প্রবেশ)

সখীরা—এ দিকে, এ দিকে আর্যা গৌতমী।

গৌতমী—তোমার গায়ের জ্বালা কমেছে মা?

(এই বলে স্পর্শ করেন)

শকুন্তলা—আর্যা আমি একটু ভাল।

গৌতমী—এই কুশের জলে তোমার শরীরের সব অসুখ চলে যাবে। (শকুন্তলার মাথায় জল ছিটিয়ে) বাছা, দিন শেষ হল, তাইতে চল আমরা কুটীরে যাই। (প্রস্থান)

শকুন্তলা—(নিজের মনে) মন, প্রথমে মনের আকাঙ্ক্ষাকে কাছে পেয়েও কাতর ভাব ছাড়নি। এখন দুঃখের সাথে বিচ্ছেদ এল—তাতে জ্বালা কিসের? (এক পা এগিয়ে প্রকাশ্যে।) জ্বালা নিবিয়ে দেয়া লতার কুঞ্জ, আবারও উপভোগ করবার জন্যে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই। (দুঃখের সাথে শকুন্তলা আর অন্যরা বেরিয়ে যায়।)

রাজা—(আগের জায়গায় এসে নিঃশ্বাস ফেলে) ওঃ, চাওয়াকে পেতে অনেক বাধা—

টানা পাঁপড়ি চোখ মেয়ে, কাঁধের দিকে বারে
বারে ঘোরাণো মুখ,—আঙুল দিয়ে ঢাকা ঠোঁট,
আধবলা নিষেধের কথায় অপরূপ, সে মুখ
আমি একটু উঁচু করেছিলাম কিন্তু চুমু খাইনি।

এখন আমি কোথায় যাই ? না, এই লতার কুঞ্জে প্রিয়া ছিল এখানেই একটু থাকি (চারদিকে তাকিয়ে)—

পাথরের উপরে তার শরীরের ভারে মিইয়ে
যাওয়া এই ফুলের বিছানা, নখ দিয়ে পদ্মপাতায়
লেখা তার এই ম্লান প্রেমপত্র, তার হাত থেকে
খুলে পড়া এই মৃণালের বালা—এ সবে চোখ
লেগে থাকে। খালি হলেও হঠাৎ এই বেতের
কুঞ্জ ছেড়ে যেতে পারছিনা।

(আকাশে)—রাজা—

সন্ধ্যাবেলার হোমের কাজ সুরু হলে আগুন
জ্বালানো বেদীর চারপাশে সন্ধ্যার মেঘের মত
রাক্ষসদের শ্যামলরঙের ছায়া নানা ভাবে ভয়
দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাজা—(সগর্বে শুনে) তপস্বীরা ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না—এই আমি এলাম বলে।

(বেরিয়ে যায়)

চতুর্থ অঙ্ক

(তারপর ফুল তোলার অভিনয় করতে করতে সখী দুজনের প্রবেশ)

অনসূয়া—ওলো প্রিয়ংবদা, যদিও গন্ধর্ব বিয়ে করে শকুন্তলা মনের মত স্বামী পাওয়াতে মনটা আমার সুস্থির হয়েছে, তবুও এইটুকুন চিন্তা করা উচিত।

প্রিয়ংবদা—কি রকম ?

অনসূয়া—আজ সেই রাজর্ষিকে যজ্ঞ শেষ হওয়ায় ঋষিরা বিদায় দিয়েছেন। নিজের নগরে যেয়ে অন্তঃপুরে পৌঁছে এখানকার ঘটনা কি তিনি মনে রেখেছেন, না রাখেননি ?

প্রিয়ংবদা—এ ব্যাপারে বিশ্বাস কর। ওই রকম যাঁদের গড়ন তাঁরা গুণের বিরুদ্ধে যান না। কিন্তু বাবা এখন এই ঘটনা শুনে কি মনে করবেন জানিনা।

অনসূয়া—আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি তিনি মত দেবেন।

প্রিয়ংবদা—কি রকম ?

অনসূয়া—গুণবানের হাতে কন্যা সম্প্রদানই প্রথম কর্তব্য। সেই কাজ যদি দৈব করে দেয়, তাহলে বিনা চেষ্টায়ই গুরুজনের কাজ হয়ে গেল।

প্রিয়ংবদা—তা বটে, (ফুলের সাজির দিকে তাকিয়ে) পূজোর জন্যে যথেষ্ট ফুল তোলা হয়েছে।

অনসূয়া—কিন্তু প্রিয়সখী শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজো করতে হবে।

প্রিয়ংবদা—ঠিক। (দুজনে সেইরকম অভিনয় করে।)

(নেপথ্যে)—শুনছ, আমি এখানে।

অনসূয়া—(কান দিয়ে)—সখি, অতিথি বলে মনে হচ্ছে।

প্রিয়ংবদা—তবে কুটিরে শকুন্তলা আছে। (নিজের মনে)—আজ আবার মনটা কাছে নেই।

অনসূয়া—থাক্, আর ফুলের দরকার নেই। (দুজনে রওনা হয়)

(নেপথ্যে)—ওরে অতিথিকে অপমান করা মেয়ে—

যাকে এক মনে ভাবছ বলে আমি তপস্বী এসেছি জানতে পারছনা, সে উন্মাদের আগের কথার মত, মনে করিয়ে দিলেও তোমাকে চিনবে না।

প্রিয়ংবদা—হায় হায় ছি ছি, অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেল। অন্যমনস্ক শকুন্তলা পূজনীয় কারো কাছে অপরাধ করেছে।

অনসূয়া—(সামনে দেখে) যে সেও নন। ইনি হলেন সহজে রেগে যাওয়া মহর্ষি দুর্বাসা। ওইরকম শাপ দিয়ে, তাড়াতাড়ি পা ফেলে, না থেমে, ফিরে যাচ্ছেন।

প্রিয়ংবদা—আগুন ছাড়া কে আর পোড়াতে পারে। তাহলে যা, পায়ে ধরে প্রণাম করে ওঁকে ফিরিয়ে আন। আমি ততক্ষণ জল আর অর্ঘ্য জোগাড় করি।

অনসূয়া—বেশ। (বেরিয়ে যায়)

প্রিয়ংবদা—(এক পা যেয়ে পা হড়কে যাবার অভিনয় করে) ও মা, মনের আবেগে পা হড়কে হাত থেকে ফুলের সাজি পড়ে গিয়েছে। (এই বলে ফুল তোলার অভিনয় করে)

অনসূয়া—(প্রবেশ করে) স্বভাব ওঁর কুটিল, কার অনুনয় শুনবেন। কোনরকমে ওঁকে আবার একটু সদয় করা হয়েছে।

প্রিয়ংবদা—(হেসে) ওঁর বেলায় এও অনেক। তাহলে বল, কি করে তাঁকে সদয় করলি।

অনসূয়া—যখন ফিরতে চাইলেন না, তখন আমি পায়ে পড়ে বললাম, ভগবান, যে আপনার তপস্যার ক্ষমতা জানে না, যে আপনার মেয়ের মত, প্রথম বলে তার একটি অপরাধ ভগবান আপনার ক্ষমা করতে হবে।

প্রিয়ংবদা—তারপর ? তারপর ?

অনস্যূয়া—"আমার কথার অন্যথা হতে পারে না। তবে অভিজ্ঞান (স্মারক) আভরণ দেখলে শাপ মুক্ত হবে।" এই বলতে বলতে নিজে অন্তর্হিত হলেন।

প্রিয়ংবদা—এখন আশ্বস্ত হতে পারি।

অনস্যূয়া—যাবার সময় মনে রাখবার জন্যে নিজের নাম লেখা আংটি রাজর্ষি নিজে পরিয়ে দিয়েছেন। সেটা আছে, তাতে উপায়টা শকুন্তলার নিজের হাতেই থাকবে।

অনস্যূয়া—সখি, চল ওর দেবকার্য করি।

(এই বলে হাঁটতে থাকে)

প্রিয়ংবদা—(দেখে) অনস্যূয়া দেখ,-বাঁহাতের উপর মুখ রেখে প্রিয়-সখী, যেন আঁকা ছবি। স্বামীর চিন্তায় ও নিজেকেই ভাবতে পারছে না, আর আগন্তুকের কথা কি ?

অনস্যূয়া—প্রিয়ংবদা, এ ঘটনা আমাদের মনের ভিতরেই থাক। কোমল স্বভাব প্রিয়সখীকে রক্ষা করাই উচিত।

প্রিয়ংবদা—নবমল্লিকায় কে আর গরম জল ছিটিয়ে দেয় ?

(দুজনে বেরিয়ে যায়)

[বিষ্কম্ভক শেষ]

(তারপর ঘুম থেকে উঠে শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য—মাননীয় কাশ্যপ প্রবাস থেকে ফিরেছেন। বেলার দিকে নজর রাখতে আমাকে আদেশ দিয়েছেন। বাইরে যেয়ে দেখি, রাত্রির কতটুকুন বাকি আছে। (ঘুরে দেখে) ওঃ, ভোর হয়েছে। কারণ—

একদিকে চাঁদ অস্তাচলে চলেছে। একদিকে
অরুণের পিছনে সূর্য দেখা যাচ্ছে, দুই শক্তির
একসাথে উদয় আর অস্ত যেন পৃথিবীকে দুই
রকম অবস্থার পরিবর্তনের কথা শিখিয়ে দিচ্ছে।

আর—

চাঁদ অস্ত গেলে সেই মনে রাখার মত সুন্দর পদ্ম আর আমার চোখে ভাল লাগে না। মেয়েদের প্রিয়জন প্রবাসে যাওয়ার দুঃখ সহ্য করা সত্যিই বড় কঠিন।

আর—

কুলগাছের উপরের হিম ভোরবেলা রাঙিয়ে দিচ্ছে। ঘুম ভাঙা ময়ূর কুশে ছাওয়া কুঁড়ে ঘরের ঢাকনা ছেড়ে বেরোচ্ছে, খুরে আঁচড়ানো বেদির পাশ থেকে সদ্য ওঠা এই হরিণ পিছন দিকটা উঁচু করে নিজের শরীর মেলে দিচ্ছে।

আরও—

যে চাঁদ সবচাইতে বড় পর্বত সুমেরুর মাথায় পা দিয়ে আকাশে উঠে অন্ধকার তাড়িয়েছিল, সেই চাঁদও আকাশ থেকে পড়ছে, তার আলোর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বেশি উপরে উঠলে খুব বড় যে তারও পতন গভীর হয়।

(যবনিকা সরিয়ে প্রবেশ করে)

অনসূয়া—যদিও যারা বিষয়ী নয় তাদের এসব নিশ্চয়ই জানা নেই, তবুও শকুন্তলার সাথে ওই রাজার ব্যবহার অনার্যের মত।

শিষ্য—হোমের বেলা হয়েছে, গুরুকে বলি।

(বেরিয়ে যায়)

অনসূয়া—ভাল ভাবে জাগলেও করি কি? নিজের করণীয় উচিত কাজেও আমার হাত-পা এগোচ্ছে না। প্রেমের দেবতার উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হোক। যার জন্যে সরল মন প্রিয়সখী মিথ্যাবাদী লোকের ভিতরে যেয়ে পড়েছে। (মনে করে) নাকি দুর্বাসার শাপে এরকম বিকার হচ্ছে? তা ছাড়া ওই রাজর্ষি সেই রকম কথা বলে এতদিনের মধ্যে একটা চিঠি পর্যন্ত পাঠালেন না।

(ভেবে) তা হলে ওই অভিজ্ঞান আংটি এখান থেকে তাকে পাঠিয়ে দিই। কষ্টে অভ্যস্ত এই তপস্বীদের কাকে অনুরোধ করব? দোষটা শকুন্তলার উপরে যাবে বলে তাত কাশ্যপ প্রবাস থেকে ফিরেছেন তাকে দুষ্যন্তের সাথে বিবাহিতা সন্তান সম্ভবা শকুন্তলার কথা বলতে পারব না। তা যদি হয়, তা হলে আমরা করি কি?

(প্রবেশ করে)

প্রিয়ংবদা—(আনন্দের সাথে) সখি, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, শকুন্তলার যাত্রামঙ্গল করতে হবে।

অনসূয়া— (আশ্চর্য হয়ে) সখি, কি করে হল?

প্রিয়ংবদা—শোন, ভাল ঘুম হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে এখন শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।

অনসূয়া—তারপর? তারপর?

প্রিয়ংবদা—তখন লজ্জায় মুখ নোয়ান ওকে তাত কাশ্যপ নিজে জড়িয়ে ধরে এইভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন—"কপালগুণে ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলেও যজমানের আহুতি আগুনেই পড়েছে। বাছা, ভাল শিষ্যকে দেয়া বিদ্যার মত তোমাতেও অনুশোচনার কিছু নেই। আজকেই তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেব। ঋষিরা অভিভাবক হয়ে যাবেন।"

অনসূয়া—এখন তাত কাশ্যপকে এ ঘটনা কে বলল?

প্রিয়ংবদা—অগ্নিগৃহে যাবার পর অশরীরী ছন্দোময়ী বাণী।

অনসূয়া—(আশ্চর্য হয়ে) বল।

প্রিয়ংবদা—(সংস্কৃতে)—

ব্রাহ্মণ জেনে রাখ, ভিতরে আগুন শমীগাছের
মত পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে দুষ্মন্তের দেয়া
তেজ কন্যা ধারণ করছে।

অনসূয়া—(প্রিয়ংবদাকে জড়িয়ে ধরে) সখি, আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আজকেই শকুন্তলাকে নিয়ে যাচ্ছে তাইতে খারাপ লাগছে, তার সঙ্গে ভালও লাগছে।

প্রিয়ংবদা—আমাদের উদ্বেগ দূর করব। সে বেচারার শান্তি হোক।

অনসূয়া—তার জন্যেই আমি এই আমগাছের ডালে নারকেলের ঝাঁপিতে অনেকদিন থাকে এই রকম বকুলফুলের মালা রেখেছি। তা এটা হাতের কাছে নে। আমিও ততক্ষণ সেই জন্যে গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, কচি দূর্বা ইত্যাদি মাঙ্গলিক জিনিসপত্রের জোগাড় করি।

প্রিয়ংবদা—তাই কর (অনসূয়া বেরিয়ে যায়, প্রিয়ংবদা ফুল নেবার অভিনয় করে)

(নেপথ্যে)— গৌতমী, শার্ঙ্গরবদের শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্যে বল।

প্রিয়ংবদা—(কান দিয়ে) অনসূয়া, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, এখুনি হস্তিনাপুরে যাবার ঋষিদের ডাকা হচ্ছে।

অনসূয়া—(মাঙ্গলিক হাতে প্রবেশ করে) সখি, সখি চল, আমরা যাই। (দুজনে হাঁটে)

প্রিয়ংবদা—(দেখে) সূর্য ওঠার সাথে সাথে স্নান করে শকুন্তলা এই অপেক্ষা করছে। তপস্বিনীরা নীবার হাতে স্বস্তি বাচন বলতে বলতে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আমরা কাছে যাই। (কাছে যায়)

(তারপর যেমন বলা হল তেমনিভাবে আসনের উপর শকুন্তলার প্রবেশ)

তাপসীদের একজন—(শকুন্তলাকে) বাছা, অনেক সম্মানের মহাদেবী উপাধি তোমার হোক।

দ্বিতীয়—বাছা, বীর প্রসবিনী হও।

তৃতীয়—বাছা, স্বামীর খুব প্রিয় হও।

(আশীর্বাদ করে গৌতমী ছাড়া সবাই বেরিয়ে যায়)

সখীরা দুজন—(কাছে এসে) সখী তোর আনন্দ-স্নান হোক।

শকুন্তলা—আমার সখীরা স্বাগত। এখানে বোস।

দুজনে—(মাঙ্গলিক পাত্র নিয়ে বসে) ওলো, প্রস্তুত হ'। আমরা এখন মাঙ্গলিক সাজে সাজাব।

শকুন্তলা—এও অনেক মনে করা উচিত। সখীরা সাজিয়ে দেবে, এ পাওয়া এখন আমার কঠিন হবে। (এই বলে চোখের জল ফেলে)

দুজনে—সখী, শুভ কাজের সময় তোর কাঁদা উচিত নয়

(এই বলে চোখের জল ফেলে সাজানোর অভিনয় করে)

প্রিয়ংবদা—গয়না পরার মত রূপ, আশ্রমের সাজে অপমান করা হচ্ছে।

(গয়না হাতে ঢুকে)

দুজন ঋষিকুমার—এই গয়না, ওঁকে পরিয়ে দিন।

(সবাই দেখে আশ্চর্য হয়)

গৌতমী—বাছা নারদ, এগুলো কোত্থেকে ?

প্রথম—তাত কাশ্যপের প্রভাবে।

গৌতমী—কি মন থেকে সৃষ্টি ?

দ্বিতীয়—না। শুনুন। তিনি আমাদের এই রকম আদেশ করেছিলেন "শকুন্তলার জন্যে গাছ থেকে ফুল সংগ্রহ কর" তারপর এখন—

কোন গাছ চাঁদের মত সাদা শুভ কাজের পাট
কাপড় বার করে দিল ; কোন গাছ পা রাঙানোর
সুন্দর লাক্ষা রস বার করল ; অন্যান্য গাছ থেকে
বনের দেবতারা কচিপাতা বেরোণোর মত
মনিবন্ধ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে গয়নাগুলো আমাদের
দিলেন।

প্রিয়ংবদা—(শকুন্তলাকে দেখে) ওলো, এই অনুগ্রহ তোর স্বামীর বাড়িতে রাজলক্ষ্মী হবার সূচনা (শকুন্তলার লজ্জার অভিনয়)

প্রথম—চল, গৌতম চল। কাশ্যপ স্নান শেষ করেছেন। বনস্পতিদের সেবার কথা বলি।

দ্বিতীয়—বেশ। (দুজনে বেরিয়ে যায়)

দুজনে—ওরে, গয়না আমরা পরিনি। ছবি আঁকার যে পরিচয় তাই দিয়ে তোর গায়ে গয়না পরাব।

শকুন্তলা—তোদের নিপুণতা জানি, (দুজনে গয়না পরাণোর অভিনয় করে।)

(তারপর স্নান সেরে কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ—

আজ শকুন্তলা যাচ্ছে, তাইতে মনটা ব্যাকুল হয়েছে ; অশ্রুতে গলা ধরে গিয়েছে, চিন্তায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন। বনবাসী আমিও এইরকম ভালবাসায় বিকল হয়েছি। আহা, গৃহীদের মেয়ের সাথে নতুন বিচ্ছেদ কতই না কষ্ট দেয়।

(এই বলে হাঁটতে থাকেন)

সখীরা—ওরে শকুন্তলা, সাজান শেষ হয়েছে, এখন পাট কাপড়ের জোড় পর।

(শকুন্তলা উঠে কাপড় পরে)

গৌতমী—বাছা, এই তোমার গুরু এসেছেন, আনন্দ ঝরে পড়া চোখ দিয়ে যেন জড়িয়ে ধরছেন। এখন আচার পালন কর।

(শকুন্তলা লাজুকভাবে প্রণাম করে)

কাশ্যপ—বাছা—

যযাতির শর্মিষ্ঠার মত, তুমি স্বামীর প্রচুর আদরের পাত্রী হও। তার পুরুর মত তোমারও সম্রাট ছেলে হোক।

গৌতমী—ভগবান্, এ বর, আশীর্বাদ নয়।

কাশ্যপ—বাছা, এই সদ্য আহুতি দেয়া আগুন প্রদক্ষিণ কর।

(সবাই হাঁটে)

কাশ্যপ—

ওই বেদীর চারপাশে বিহিত জায়গায় পাশ দিয়ে কুশ ছড়ানো, সমিধ দেয়া যজ্ঞের আগুন ঘিয়ের গন্ধে তোমার পাপ দূর করুক।

(শকুন্তলা প্রদক্ষিণ করে) বাছা, এখন রওনা হও (তাকিয়ে) শার্ঙ্গরব ওরা কোথায় ?

(প্রবেশ করে)

শিষ্যরা—ভগবান, আমরা এখানে।

[illegible]

শার্ঙ্গরব—এদিকে আসুন আপনি, এদিকে।

(এই বলে সবাই হাঁটতে থাকে)

কাশ্যপ—তপোবনের কাছের গাছরা শোন—

তোমাদের খাওয়া না হলে যে আগে জল খায় না, সাজতে ভালবাসলেও যে তোমাদের ভাল-বাসে বলে নতুন পাতাওয়ালা ডাল ভাঙে না, তোমাদের প্রথম ফুল ফোটার সময় যে উৎসব করে, এই সেই শকুন্তলা স্বামীর বাড়ী যাচ্ছে. *সবাই অনুমতি দাও।*

(কোকিলের ডাক শোনা যায়)

এই শকুন্তলার বনে থাকার বন্ধুরা যাবার অনুমতি দিল। তারা কোকিলের ডাকে নিজেরা উত্তর দিয়েছে।

(আকাশে)—

পথ ওর মঙ্গলময় হোক। মাঝে মাঝে শ্যামল পদ্মের সরোবরে রমণীয় হোক, ছায়াময় গাছে রোদের তাপ নরম হোক, ধূলো পদ্মের রেণুর মত কোমল হোক, শান্ত, অনুকূল বাতাস হোক।

(সবাই আশ্চর্য হয়ে শোনে)

গৌতমী—বাছা, তপোবনের দেবতারা আত্মীয়ের মত ভালবাসেন, তাঁরা যাবার অনুমতি দিয়েছেন, দেবতাদের প্রণাম কর।

শকুন্তলা—(প্রণাম করে একটু হেঁটে জনান্তিকে) প্রিয়ংবদা, আর্যপুত্রকে দেখতে বড় ইচ্ছা। তবুও আশ্রমের এলাকা ছেড়ে যেতে খুব দুঃখে আমার পা সামনে এগোচ্ছে।

প্রিয়ংবদা—তপোবনের বিরহে শুধু সখাই দুঃখিত তা নয়, তুই চলে যাচ্ছিস তাইতে তপোবনের অবস্থাও এখন দেখ।—

হরিণের মুখ থেকে কুশ ঝরে পড়ছে, ময়ূর নাচা

বন্ধ করেছে, লতাদের হলদে পাতা ঝরে পড়ছে,
যেন তারা চোখের জল ফেলছে।

শকুন্তলা—(মনে করে) বাবা, লতাবোন বনজ্যোৎস্নাকে এখন বিদায় জানাই।

কাশ্যপ—তুমি ওকে বোনের মত ভালবাস জানি, এই যে ডাইনে।

শকুন্তলা—(কাছে যেয়ে লতাকে জড়িয়ে ধরে) আমগাছের সাথে মিলন হলেও, এদিককার হাতের মত আঁকড়িগুলো দিয়ে আমার সঙ্গে কোলাকুলি কর। আজ থেকে আমি তোমার অনেক দূরে হয়ে যাব।

কাশ্যপ—বাছা—

নিজের গুণে তুমি তোমার উপযুক্ত স্বামী
পেয়েছ। আমি প্রথম থেকে তোমার জন্যে তাই
চেয়েছিলাম। এই নবমল্লিকার আমগাছের
সাথে মিলন হয়েছে। তোমার জন্যে আর ওর
জন্যে আমার এখন চিন্তা রইল না।

এখন পথের দিকে রওনা হও।

শকুন্তলা—(সখীদের কাছে যেয়ে) ওলো, দুজনের হাতে একে ছেড়ে গেলাম।

দুজনে—এই মানুষ কার হাতে রইল। (এই বলে দুজনে চোখের জল ফেলতে থাকে।)

কাশ্যপ—অনসূয়া কেঁদনা। বরং তোমাদের দুজনের শকুন্তলাকে শান্ত করা উচিত। (সবাই হাঁটে)

শকুন্তলা—(দেখে) কুটীর পর্যন্ত চলাচল করছে, গর্ভভারে মন্থর এই মৃগবধূর নির্বিঘ্নে প্রসব হলে কোন লোককে দিয়ে সুসংবাদটা পাঠিও বাবা।

কাশ্যপ—বাছা, এ আমি ভুলব না।

শকুন্তলা—(হাঁটা থামানোর ভঙ্গি করে) ওমা, আমার কাপড়ে এ কে লেগে আছে? (এই বলে ঘোরে)

কাশ্যপ—বাছা—

সুচের মত কুশ বিঁধলে যার মুখে তুমি ঘা
সারাণোর ইঙ্গুদী তেল মাখিয়ে দিতে, মুঠো মুঠো
শ্যামাক ঘাস দিয়ে যাকে বড় করেছো, ছেলের
মত এই সেই হরিণ তোমার রাস্তা ছাড়ছে না।

শকুন্তলা—একসাথে থাকা ছেড়ে যাচ্ছি আমি, আমার পিছনে কেন আসছিস বাছা? প্রসবের পরে মা ছাড়াই বড় হয়েছিস। এখনও আমি না থাকলে বাবা তোর কথা ভাববেন। এবার ফিরে যা।

(এই বলে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়)

কাশ্যপ—বাছা, কেঁদো না। স্থির হও। এখান থেকে রাস্তার দিকে দেখ—

পাঁপড়ি উপরে ওঠানো চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপসা
হয়েছে। শক্ত হয়ে চোখের জলের স্রোত বন্ধ
কর। উঁচু-নীচু মাটি এই রাস্তায় লক্ষ্য না
করাতে তোমার পা ঠিকমত পড়ছে না।

শার্ঙ্গরব—ভগবান, ভালবাসার লোকদের জলের ধার অবধি এগিয়ে দেয়া উচিত বলে শোনা যায়। সেই জন্যে এই দীঘির ধার, এখানে আমাদের উপদেশ দিয়ে আপনি ফিরতে পারেন।

কাশ্যপ—তা হলে আমরা এই ক্ষীর গাছের ছায়াই আশ্রয় করি। (এই বলে সবাই ঘুরে দাঁড়ায়)

কাশ্যপ—(নিজের মনে) আমি এখন মাননীয় দুষ্মন্তের উপযুক্ত কি কথা বলি? (এই বলে চিন্তা করতে থাকেন)

শকুন্তলা—(জনান্তিকে) ওরে দেখ, পদ্মপাতার আড়ালে চক্রবাকী আকুল হয়ে চিৎকার করছে। আমি খুব কঠিন কাজই করছি।

অনসূয়া—সখি, এ রকম বলিস না।—

এও প্রিয় ছাড়া, দুঃখে আরও বড় রাত কাটায়,
দুঃখ খুব বেশি হলেও আশাতে বাঁধা থাকলে
সহ্য করা যায়।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

কাশ্যপ—শার্ঙ্গরব, শকুন্তলাকে সামনে রেখে তুমি রাজাকে আমার এই কথা বলবে।

শার্ঙ্গরব—আদেশ করুন আপনি।

কাশ্যপ—

আমাদের ধন সংযম। আমাদের কথা নিজের
উঁচুবংশের কথা আর আপনার প্রতি ওর ভালবাসা,
সে ভালবাসা কোন বন্ধুরই সাহায্যে হয়নি,
সব ভালভাবে ভেবে ওকে অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে
সমান ভাবে দেখবেন। তারপর ভাগ্যের উপরে,
বধূর বন্ধুদের তার বেশি বলা উচিত নয়।

শার্ঙ্গরব—বাণী গ্রহণ করলাম।

কাশ্যপ—(শকুন্তলাকে দেখে) বাছা, তোমাকে এখন উপদেশ দেব। আমরা বনে থাকলেও সাংসারিক ব্যাপার জানি।

শার্ঙ্গরব—ভগবান্। জ্ঞানীদের না জানা কোন বিষয়ই নেই।

কাশ্যপ—

এখান থেকে স্বামীর ঘরে যেয়ে গুরুজনদের সেবা
করবে। সপত্নীদের সাথে প্রিয়সখীর মত
ব্যবহার করবে। স্বামী অসম্মান করলেও রাগ
করে তার বিরুদ্ধে যেওনা, দাক্ষিণ্যে পরিজনদের
কাছে উদার হবে, সম্পদে গর্বিত হয়ো না। এই
রকম যুবতীরা গৃহিণী পদ পায়। যারা অন্যরকম
তারা বংশের কাঁটা।

গৌতমীই বা কি মনে করেন?

গৌতমী—এ সবই বধূদের উপদেশ। বাছা, এই সবই মনে রেখ।

কাশ্যপ—বাছা এস। আমার আর সখীদের সাথে কোলাকুলি কর।

শকুন্তলা—বাবা, এখান থেকেই কি প্রিয়সখীরা ফিরে যাবে।

কাশ্যপ—বাছা, এদেরকেও দান করতে হবে। সেই জন্যে ওদের ওখানে যাওয়া উচিত নয়। তোমার সাথে গৌতমী যাচ্ছেন।

শকুন্তলা—(বাবাকে জড়িয়ে ধরে) এখন বাবার কোল ছেড়ে মলয়ের প্রান্ত থেকে উপড়ে আনা চন্দন গাছের মত বিদেশে কি করে আমি বাঁচব ?

কাশ্যপ—বাছা, এ রকম কাতর হয়েছ কেন ?—

অভিজাত স্বামীর গৃহিণীর মর্যাদায় থেকে
তার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের জন্যে প্রতিমুহূর্তে
কাজে ব্যস্ত থেকে আর অল্পদিনের ভিতরে পূব
দিকের সূর্যের মতন পবিত্র সন্তান প্রসব করে ;
বাছা, আমার বিরহের দুঃখ বুঝতে পারবে না।

(শকুন্তলা বাবার পায়ে পড়ে)

কাশ্যপ—বাছা, আমার যা ইচ্ছা তোমার তাই হোক।

শকুন্তলা—(সখীদের কাছে যেয়ে) ওরে, তোরা দুজনে একসাথে আমার সাথে কোলাকুলি কর।

সখীরা—(তাই করে) যদি সেই রাজর্ষির মনে পড়তে দেরি হয়, তাহলে তাঁকে নিজের নাম লেখা এই আংটিটা দেখাস।

শকুন্তলা—এই সন্দেহে আমি কেঁপে উঠছি।

সখীরা—ভয় পাসনা। বেশি ভালবাসা অমঙ্গলের ভয় করে।

শার্ঙ্গরব—(দেখে) সূর্য আরও উপরে উঠেছে, আপনি তাড়াতাড়ি করুন।

শকুন্তলা—(আবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে আর আশ্রমের দিকে মুখ করে) বাবা, আবার কবে তপোবন দেখব ?

কাশ্যপ—শোন—

চারদিক, এই পৃথিবীর সপত্নী হয়ে বহুদিন
কাটিয়ে, অপরাজেয় সন্তান দুষ্মন্তের ছেলেকে
বসিয়ে, তার হাতে কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের ভার
দিয়ে, স্বামীকে নিয়ে শান্ত এই আশ্রমে আবার
পা দেবে।

গৌতমী—তোর যাবার বেলা বাছা বয়ে যাচ্ছে, সেই জন্যে বাবাকে

ফিরিয়ে পাঠা, তা ছাড়া উনি অনেক্ষণ ধরে বার বার এইরকম বলবেন। সেই জন্যে আপনি ফিরুন।

কাশ্যপ—বাছা, আমার তপস্যার অনুষ্ঠানের বাধা হচ্ছে।

শকুন্তলা—(বাবাকে আবার জড়িয়ে ধরে) তপস্যা করে বাবার শরীরটা রোগা হয়ে গিয়েছে। তাইতে আমার জন্যে বেশি চিন্তা করো না।

কাশ্যপ—(নিশ্বাস ফেলে)—

তোমার রচনা করা নীবার ধানের নৈবেদ্য
কুটিরের দরজায় অঙ্কুরিত হচ্ছে, তা দেখে আমার
শোক কি করে শান্ত হবে ?

যাও, পথ তোমার মঙ্গলময় হোক।

(শকুন্তলা সঙ্গীদের নিয়ে চলে যায়)

সখীরা—(শকুন্তলাকে অনেকক্ষণ দেখে করুণ ভাবে) হায়, হায় শকুন্তলা বনের আড়াল হয়ে গেল।

কাশ্যপ—(নিশ্বাস ফেলে) অনসূয়া, তোমাদের সঙ্গিনী চলে গিয়েছে। শোক চেপে আমার সঙ্গে এস।

(শকুন্তলা আর তার সঙ্গীরা প্রস্থান করে)

দুজনে—শকুন্তলা ছাড়া যেন শূন্য তপোবনে আমরা ঢুকছি।

কাশ্যপ—ভালবাসাতেই এইরকম দেখায় (দুঃখিতভাবে হেঁটে) ওঃ, শকুন্তলাকে স্বামীর বাড়ীতে পাঠিয়ে এখন সুস্থ হয়েছি।—

মেয়ে পরের সম্পত্তিরই মত। তাকে আজ
স্বামীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে গচ্ছিত সম্পদ
ফেরৎ দিলে যেরকম হয় সেইরকম আমার এই
অন্তরাত্মা বড় শান্ত হয়েছে।

(সবাই বেরিয়ে যায়)

পঞ্চম অঙ্ক

(তারপর আসনের উপরে রাজা, বিদূষক আর স্থানানুসারে পরিজনদের প্রবেশ। নেপথ্যে বীণার শব্দ)

বিদূষক—(কান দিয়ে) ওগো বন্ধু, গানের ঘরের দিকে মন দিন। বীণাতে শুদ্ধ তাললয়ে সুর শোনা যাচ্ছে। মাননীয়া হংসপদিকা সুর অভ্যাস করছেন জানি।

রাজা—চুপ কর, শুনছি।

(আকাশে)

গান

নতুন মধুতে তোমার লোভ, আমের মুকুলকে
ওইভাবে চুমু খেয়ে পদ্মে বসেই তৃপ্তি পেলে?
মধুকর একে কি করে ভুললে?

রাজা—আহা, দরদে ভরা গান।

বিদূষক—ওগো বন্ধু, গানের কথার মানে বুঝলেন?

রাজা—(হেসে) ওর সঙ্গে একবারই প্রেম করেছি। সেই জন্যে দেবী বসুমতীকে উপলক্ষ্য করে ও আমাকে প্রচুর বকেছে। বন্ধু মাধব্য, আমার কথায় হংসপদিকাকে বল, আমাকে নিপুণভাবে তিরস্কার করা হয়েছে।

বিদূষক—আপনার যা আদেশ। (উঠে) ওগো বন্ধু, অন্যের হাত দিয়ে চুলের মুঠো ধরিয়ে মার দিতে থাকলে যার অনুরাগ নেই তাকে অপ্সরা ধরার মত এবার আমার মুক্তি নেই।

রাজা—যাও, নাগরিকের মত ব্যবহার করে ওকে শান্ত কর।

বিদূষক—গতি কি?

রাজা—(স্বগত) প্রিয়জনের বিরহ হয়নি, তবুও কেন গানের অর্থ শুনে এত বেশি আকুল হলাম ? নাকি—

মধুর শব্দ শুনে আর সুন্দর জিনিস দেখে যে
সুখী হলেও আকুল হয়ে ওঠে সে আগে না বোধ
করা পূর্বজন্মের ভালবাসার স্থিরভাব নিশ্চয়ই
চেতনায় স্মরণ করে।

(এই বলে আকুল হয়ে থাকেন)

(তারপর কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী—আহা, এই অবস্থায়ই পৌঁছেছি।—

রাজার ভিতর বাড়ীর নিয়ম বলে যে বেতের
লাঠি আমি নিয়েছিলাম, সেই লাঠিই কালে
কালে অনেক দিন গেলে, চলার ক্ষমতা চলে
যাওয়াতে আমার নির্ভর হল।

শুনুন, ধর্মকার্যে দেরি করা রাজার উচিত নয় সত্যি। তবুও এখুনি ধর্মাসন থেকে উঠেছেন, তাকে আবার উদ্বিগ্ন করা, কণ্বের শিষ্যদের আসার খবর দেবার উৎসাহ আমার নেই।—

নাকি—এই রাজ্যশাসনে বিশ্রাম নেই ?—

সূর্য ঘোড়া একবারই জোড়েন ; বাতাস দিন-
রাত্রি বয়ে চলে, শেষনাগ সব সময়ই পৃথিবীর
ভার বয় আর ছ'ভাগের একভাগ যাদের বৃত্তি
তাদেরও এই ধর্ম।

বেশ কর্তব্য করি। (যেয়ে দেখে) এই রাজা—

সন্তানের মত পৃথিবীকে পালন করে শ্রান্ত
হয়ে একা বিশ্রাম করছেন। সারাদিন
দলকে চালিয়ে পরে শ্রান্ত হয়ে, ঠাণ্ডা গুহায়
যেন হাতীদের রাজা।

(কাছে যেয়ে) জয় হোক, জয় হোক, প্রভু, কাশ্যপের খবর নিয়ে তপস্বীরা এসেছেন। তাঁরা হিমগিরির প্রান্তে বনে

থাকেন। তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীলোক আছেন। প্রভু, শুনে যা হয় করবেন।

রাজা—(আশ্চর্য হয়ে) কি কাশ্যপের খবর নিয়ে তপস্বীরা ? সঙ্গে স্ত্রীলোক ?

কঞ্চুকী—হ্যাঁ।

রাজা—তাহলে উপাধ্যায় সোমরাতকে আমার নাম করে বল, বেদ-বিধান অনুসারে ঐ আশ্রমবাসীদের সৎকার করে নিজেই নিয়ে আসতে। আমিও এখানে তপস্বীদের সাথে দেখা করার উপযুক্ত জায়গায় অপেক্ষা করতে থাকি।

কঞ্চুকী—প্রভুর যা আদেশ। (বেরিয়ে যায়)

রাজা—(উঠে) বেত্রবতি, অগ্নিগৃহের রাস্তা দেখাও।

প্রতিহারী—এদিকে প্রভু, এদিকে।

রাজা—(হেঁটে, নিজের কাজের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে) যা চায় তাই পেলে প্রাণীমাত্রেই সুখী হয় কিন্তু রাজাদের যা চায় তাই পাওয়া দুঃখই পাওয়া। প্রতিষ্ঠায় কেবল ঔৎসুক্যই যায়।—

> যা পাওয়া গেল তা পালন করতেও কষ্ট।
> রাজ্য পরিশ্রম বাড়ানোর জন্যে যতটা,
> পরিশ্রম কমানোর জন্যে ততটা নয়। এ যেন
> নিজের হাতে রোদ আটকানো ছাতার হাতল
> ধরা।

(নেপথ্যে) দুজন বৈতালিক—মহারাজের জয় হোক।

প্রথম—

> নিজের সুখে কোন অভিলাষ নেই। প্রজার
> জন্যে দিনের পর দিন পরিশ্রম কর, নাকি
> তোমার কাজের নিয়মই এই। গাছ তীব্র
> গরম নিজের মাথায় ভোগ করে, আশ্রিতদের
> তাপ ছায়া দিয়ে দূর করে।

দ্বিতীয়—

নিজের দণ্ড দিয়ে যারা বিপথে যায় তাদের নিয়মিত কর, বিবাদ শান্ত কর, রক্ষা করতে চেষ্টা কর। ভাল সময়ে প্রজাদের অনেক আত্মীয় থাকলেও বন্ধুর কাজ কিন্তু তুমিই কর।

রাজা—(শুনে) এরা আমার ক্লান্ত মনকে তাজা করে দিল।

(এই বলে হাঁটতে থাকেন)

প্রতীহারী—সবেমাত্র ঝাঁট দেয়াতে সুন্দর এই অগ্নিগৃহের বারান্দা, পাশে যজ্ঞের গরু, উঠুন প্রভু।

রাজা—(উঠে পরিজনদের কাঁধ ধরে অপেক্ষা করতে করতে) বেত্রবতি, ভগবান কাশ্যপ কি উদ্দেশ্যে আমার কাছে ঋষিদের পাঠিয়েছেন—

তপস্বীদের যাঁরা তপস্যা সুরু করেছেন, বিঘ্নে কি তাঁদের তপ দূষিত হল? না তপোবনে যাঁরা থাকেন তাঁদের কেউ ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছে? নাকি আমার কোন খারাপ কাজের জন্যে লতায় ফুল হওয়া বন্ধ হয়েছে? এই সব নানা জল্পনা-কল্পনায় চিন্তিত আমার মন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

প্রতীহারী—প্রভুর শক্ত হাত। আশ্রমকে প্রভু তুষ্ট রেখেছেন। সেখানে এ রকম হবে কি করে? আমি কিন্তু ভাবছি আপনার ভাল কাজের জন্যে ঋষিরা আপনাকে অভিনন্দিত করতে আসছেন। (তারপর গৌতমীর সাথে শকুন্তলাকে সামনে রেখে মুনিদের প্রবেশ। এঁদের সামনে আবার কঞ্চুকী আর পুরোহিত।)

কঞ্চুকী—এদিকে, এদিকে আসুন আপনারা।

শার্ঙ্গরব—শারদ্বত—

মহান্ এই রাজা, নিশ্চয়ই কখনো বিপথে যান না। এমন কি সব চাইতে নিচু বর্ণেরও কেউ

বিপথে যায় না। তবুও সব সময়ই নির্জনতায়
অভ্যস্ত আমি, মানুষে ভরা এই জায়গাকে
আমার আগুনে ঘেরা ঘরের মত মনে
হচ্ছে।

শারদ্বত—শহরে ঢুকে এখন আপনি এই রকমই হয়েছেন।—
যে স্নান করেছে সে, যে তেল মেখেছে অথচ
স্নান করেনি তাকে যা ভাবে, শুচিশুদ্ধ লোক
অশুচি লোককে যা ভাবে, যে জেগে আছে
সে ঘুমন্ত লোককে যে রকম ভাবে, স্বাধীন
যার গতি সে বদ্ধলোককে যা ভাবে, এখানে
সুখের সাথী এই সমস্ত লোককে আমিও তাই
মনে করি।

শকুন্তলা—(কুলক্ষণের অভিনয় করে) মাগো, আমার ডান চোখ কেন নাচছে ?

গৌতমী—বাছা, অমঙ্গল দূর হোক। তোমার স্বামীর কুলদেবতারা তোমাকে সুখী করুন।

(এই বলে হাঁটতে থাকেন)

পুরোহিত—(রাজাকে দেখিয়ে) তপস্বীরা শুনুন। উনি মাননীয় বর্ণাশ্রমের রক্ষক, ওখানে আগেই আসন ছেড়ে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওঁকে দেখুন।

শার্ঙ্গরব—হে মহাব্রাহ্মণ। এ কাজকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানানো উচিত। তবুও এ ব্যাপারে আমরা মাঝামাঝি, কারণ—
ফল হলে গাছ নুয়ে পড়ে। নতুন জলের ভারে
মেঘ নিচে নেমে আসে, ভাল লোকেরা সমৃদ্ধিতে
উদ্ধত হয় না। যারা পরোপকারী তাদের
স্বভাবই এই রকম।

প্রতীহারী—প্রভু, মুখ খুশি দেখাচ্ছে। ঋষিদের কাজ বিশ্বাস করা যায় বলে মনে হয়।

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে) এখন—

> শীর্ণপাতার ভিতরে কচিপাতার মত, ঘোমটা
> ঢাকা শরীরের লাবণ্য বেশি প্রকাশ পায়নি,
> এখানে তপস্বীদের ভিতরে কে এই মহিলা ?

প্রতীহারী—প্রভু, গভীর কৌতূহলে আমার যুক্তি এগোচ্ছে না। কিন্তু মনে হয় ওঁর রূপ দেখার মতন।

রাজা—তা হোক, পরের স্ত্রীকে খুঁটিয়ে দেখতে নেই।

শকুন্তলা—(বুকে হাত দিয়ে নিজের মনে) বুকটা এ রকম কাঁপছ কেন ? আর্যপুত্রের সেই ভাব মনে করে এখন স্থির হও।

পুরোহিত—(সামনে যেয়ে) প্রভুর মঙ্গল হোক, এই যে তপস্বীরা—। এঁদের শাস্ত্রমতে সংকার করা হয়েছে। এঁদের গুরুর কাছ থেকে কিছু খবর আছে। প্রভুর শোনা দরকার।

রাজা—শুনছি।

ঋষিরা—(হাত তুলে) জয় হোক রাজা।

রাজা—আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

ঋষিরা—ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

রাজা—মুনিদের তপস্যায় কোন বিঘ্ন নেই ত ?

ঋষিরা—

> ভাল লোকদের আপনি রক্ষা করছেন, ধর্ম
> কাজে বিঘ্ন কি করে হবে ? সূর্য তাপ দিতে
> থাকলে অন্ধকার কি করে আসবে ?

রাজা—আমার 'রাজা' শব্দের সত্যিই অর্থ আছে। তারপর পৃথিবীকে অনুগ্রহ করার জন্যে ভগবান কাশ্যপ কুশলে আছেন ত ?

শার্ঙ্গরব—মহারাজ, সিদ্ধপুরুষের কুশলে থাকা নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। তিনি আগে আপনার কুশল প্রশ্ন করে এই কথা বলেছেন।

রাজা—ভগবান কি আদেশ করেছেন ?

শার্ঙ্গরব—আপনারা দুজনে শপথ করে আমার এই মেয়েকে আপনি

বিয়ে করেছেন। আমি খুশি মনে তাতে আপনাদের দুজনকে অনুমতি দিচ্ছি। কারণ—

আমার মতে পূজনীয়দের ভিতরে আপনি শ্রেষ্ঠ
আর শকুন্তলা যেন ভাল কাজ মূর্তি ধরে আছে।
সমান-গুণের বধূ আর বরের মিলন ঘটিয়ে,
প্রজাপতির নামে চিরকাল যে কথা রয়েছে তা
আর রইলনা।

সুতরাং একসাথে ধর্মাচরণের জন্যে সন্তানসম্ভবা একে গ্রহণ করুন।

গৌতমী—আর্য, আমিও কিছু বলতে চাই। আমার কথা বলার উপায় নেই। কারণ—

ও গুরুজনদের অপেক্ষা করেনি। তুমিও বন্ধুদের
জিজ্ঞাসা করনি। একা একজনের সঙ্গে যে
ব্যবহার করেছ, সেখানে অন্য একজন একজনকে
কি বলবে?

শকুন্তলা—(নিজের মনে) আর্যপুত্র কি বলবে?

রাজা—(ভয়ে ভয়ে শুনে) অ্যাঁ, একি উপস্থিত হল?

শকুন্তলা—(নিজের মনে) কথাগুলো যেন আগুন।

শার্ঙ্গরব—এ কিরকম? তবে আপনিই লোকচরিত্র জানেন।—

সধবা মেয়ে সতী হলেও লোকে অন্য কিছু
ভাববে বলে নিজের বংশের লোকের কাছে
থাকতে ভয় পায়। সেই জন্যে যে কোন মেয়ে
আর তার বন্ধুরা চায়, প্রিয়ই হোক, অপ্রিয়ই
হোক মেয়ে স্বামীর কাছে থাকুক।

রাজা—কি? এই মহিলাকে আমি আগে বিয়ে করেছি?

শকুন্তলা—(দুঃখের সাথে নিজের মনে) মন, তোমার আশঙ্কা ঠিকই।

শার্ঙ্গরব—আগের কাজ অপছন্দ হলে কর্তব্য অস্বীকার করা কি রাজার উচিত?

রাজা—এ রকম অসৎ কল্পনার কথা কোথা থেকে এল ?
শার্ঙ্গরব—যারা ঐশ্বর্যে মত্ত তাদের এরকম বিকার প্রায়ই হয়।
রাজা—আমাকে খুবই নিন্দা করা হল।
গৌতমী—(শকুন্তলাকে) বাছা, এক মুহূর্তের জন্যে লজ্জা ছাড়। তোর ঘোমটা সরিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তোর স্বামী তোকে চিনতে পারবে। (তাই করেন)
রাজা—(শকুন্তলাকে ভাল করে দেখে নিজের মনে)—

অমলিন রূপ এই মেয়ে এই ভাবে এসেছে।
আগে বিয়ে করেছি কি করিনি ঠিক করতে
পারছি না। সকাল বেলা ভিতরে তুষার কুন্দ
ফুলের সামনে মৌমাছির মত এমনি ভোগও
করতে পারছি না, ত্যাগও করতে পারছিনা।

(এই বলে ভাবতে থাকে)

প্রতীহারী—(নিজের মনে) আহা, প্রভু ধার্মিক।
সহজে পাওয়া এই রূপ দেখে কে অন্যকথা ভাবে ?
শার্ঙ্গরব—চুপ করে আছেন কেন রাজা ?
রাজা—তপস্বীরা শুনুন, আমি চিন্তা করেও এই মহিলাকে বিয়ে করার কথা মনে করতে পারছি না। এঁর সন্তান-সম্ভাবনার লক্ষণ স্পষ্ট। আমার পরস্ত্রী গমনের ভয় আছে, তাহলে কি করে এঁকে গ্রহণ করি ?
শকুন্তলা—(জনান্তিকে) ছি! ছি! আর্যের বিয়েতেই সন্দেহ। আমার এত উঁচু আশা এখন কোথায় ?
শার্ঙ্গরব—তাহলে করবেন না।—

মুনির মেয়েকে আপনি ধর্ষণ করেছেন। মুনি তা
মেনে নিয়েছেন। যে চুরি করেছে তাকেই
নিজের সম্পদ দান করার মত, আপনি চোরের
মত, আপনাকে মেয়ে দান করতে চেয়েছেন।
মুনিকে আপনার অপমান করাই উচিত।

শারদ্বত—শার্ঙ্গরব—তুমি এখন থাম।

শকুন্তলা, আমাদের বক্তব্য বলা হয়েছে। এই সেই মাননীয় পুরুষ, এই রকম বলছেন। ওঁকে বিশ্বাস করানোর মতন উত্তর দাও।

শকুন্তলা—(জনান্তিকে) সেই ভালবাসার এই অবস্থা হলে মনে করিয়ে কি হবে ? নাকি এখন আমার নিজের অবস্থা পরিষ্কার করে বলা দরকার, তাই এই চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র—(এই কথা অর্ধেক উচ্চারণ করে) বিয়েতেই সন্দেহ, তাইতে এ বলা ঠিক নয়। পুরুবংশের গৌরব, আগে আশ্রমে স্বাভাবিক ভাবেই সরল মন এই লোককে ওইভাবে ঠকিয়ে, এইভাবে ফিরিয়ে দেয়া নিশ্চয়ই উচিত।

রাজা—(দুই কান ঢেকে) পাপ, শান্ত হোক।

কূল ভাঙা নদী যেরকম নির্মল জলও নষ্ট করে,
পারের গাছও নষ্ট করে ; সেইরকম নিজের কুল
আর অন্য এই লোককে নিচে নামানোর চেষ্টা
করছ কেন ?

শকুন্তলা—বেশ, তুমি যে এরকম করছ তা যদি সত্যি পরস্ত্রী গ্রহণের ভয়ে হয় তাহলে এই অভিজ্ঞান দিয়ে তোমার ভয় দূর করছি।

রাজা—ভাল কথা।

শকুন্তলা—(মুদ্রার জায়গা ছুঁয়ে) হায়, হায়, আমার আঙুলে আংটি নেই। (এই বলে দুঃখে গৌতমীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

গৌতমী—তুমি যখন শক্রাবতারের ভিতরে শচীতীর্থের জল পুজো করছিলে, তখন নিশ্চয়ই আংটিটি পড়ে গিয়েছে।

রাজা—(হেসে) কথা আছে যে, "স্ত্রীলোকেরা প্রত্যুৎপন্নমতি", এ হল তাই।

শকুন্তলা—এখানে দৈবই প্রভুত্ব দেখাল। তোমাকে অন্য কথা বলছি।

রাজা—এখন শোনার ব্যাপার এল।

শকুন্তলা—বেশ, একদিন বেতের লতার ঘরে, তোমার হাতে পদ্মপাতার পাত্রে জল ছিল।

রাজা—শুনছি।

শকুন্তলা—সেই সময় আমার সেই ছেলের মতন হরিণের ছানা দীর্ঘাপাঙ্গ উপস্থিত হল। তখন তুমি দয়া করে ও আগে খাক বলে জল কাছে ধরেছিলে। সে আবার চেনে না বলে হাতের কাছে এল না। তারপর সেই জল যখন আমি ধরলাম তখন ও ভাব করল। তখন তুমি এই বলে পরিহাস করলে, "সবাই নিজের জাতকে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই বন্য।"

রাজা—এইরকম মধুর মিথ্যা কথা নিজের কাজ উদ্ধার করার জন্যে। বিষয়ী লোকেরা এতে আকৃষ্ট হয়।

গৌতমী—মহাভাগ! এরকম কথা বলা আপনার উচিত নয়। এ তপোবনে বড় হয়েছে, ছলনা জানে না।

রাজা—বৃদ্ধা তাপসী!—

যারা মানুষ নয়, তাদের স্ত্রীজাতির ভিতরে
অশিক্ষিত পটুত্ব দেখা যায়। যাদের বুদ্ধি
আছে তাদের কথা আর কি বলব। কোকিলেরা
উড়ে যাবার আগে নিজের বাচ্চাদের অন্য
পাখীদের দিয়ে পালন করায়।

শকুন্তলা—(রেগে) অনার্য! নিজের যেরকম মন সবাইকেই সেই-রকম দেখ। তৃণে ঢাকা কূয়োর মত তুমি নিজেকে ধর্মের আবরণে ঢেকে রেখেছ। অন্য কে এখন তোমার মত কাজ করবে?

রাজা—[নিজের মনে] বনবাসের জন্যে এই মহিলার রূপ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কারণ—

দৃষ্টি বাঁকা হচ্ছে না, চোখ বেশ লাল, কড়া কথা
হলেও অসংলগ্ন কথা নয়। বিম্ব ফলের মত

এঁর ঠোঁট কাঁপছে, যেন শীত লেগেছে;
ভ্রূজোড়া এমনিতে নীচু, একসাথেই আলাদা
হয়ে যাচ্ছে।

ওর রাগ দেখে মনে হচ্ছে কোন ছলনা নেই। আমার বুদ্ধিতে সন্দেহ এনে দিচ্ছে—

ভুলে যাবার জন্যে আমার মনের ভাব নিদারুণ
হয়েছে। গোপনে করা ভালবাসা আমি অস্বীকার
করছি। ভীষণ রাগে ওর চোখ দুটো টকটকে
লাল হয়েছে। বাঁকা ভ্রূজোড়া আলাদা হয়ে
গিয়েছে, যেন প্রেমের দেবতার ধনুটাই ভেঙে
গিয়েছে।

(প্রকাশ্যে) ভদ্রে, দুষ্মন্তের চরিত্র সুপরিচিত। প্রজাদের ভিতরেও এরকম দেখা যায় না।

শকুন্তলা—আমি তাহলে এখানে পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারিণী হলাম। পুরুবংশে বিশ্বাসের জন্যে আমি মুখে মধু মনে বিষ এই লোকের হাতে পড়েছি।

(এই বলে কাপড়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে)

শার্ঙ্গরব—বাধা না দেয়া নিজের চপলতা এই রকমই জ্বালায়।—

সেই জন্য গোপন মিলন খুব ভাল করে দেখে
করা উচিত। মন না জানা থাকলে বন্ধুত্ব
শত্রুতায় দাঁড়ায়।

রাজা—শুনুন, এই মহিলাকে বিশ্বাস করে কেন আমাকে দোষ দিয়ে কথা বলে কষ্ট দিচ্ছেন?

শার্ঙ্গরব—(রেগে) এই ভদ্রলোকের নোংরা উত্তর শুনলে?

জন্ম থেকে যার বঞ্চনার কোন শিক্ষা নেই তার
কথা প্রামাণ্য নয় আর যারা পরকে ঠকানো
একটা বিদ্যার মতন শেখে তাদের কথা আপ্ত
বাক্য হবে।

রাজা—ওগো সত্যবাদী, আমরা না হয় এই মেনে নিলাম। কিন্তু একে ঠকিয়ে লাভ কি?

শার্ঙ্গরব—নরক।

রাজা—পুরুবংশের লোক নরকে যেতে চায়, এ বিশ্বাস করা যায় না।

শারদ্বত—শার্ঙ্গরব, কথা কাটাকাটি করে কি হবে? গুরু যা করতে বলেছেন করা হয়েছে। আমরা ফিরে যাই। (রাজাকে)—এ আপনার স্ত্রী, একে হয় নিন, না হয় ত্যাগ করুন। স্ত্রীর উপরে সবরকম অধিকারই আছে। গৌতমী এগিয়ে যান।

(এই বলে চলে যায়)

শকুন্তলা—কি? এই ঠক লোক আমাকে ঠকিয়েছে তোমরাও আমাকে ত্যাগ করছ? (এই বলে পিছনে পিছনে যায়)

গৌতমী—(দাঁড়িয়ে) বাছা শার্ঙ্গরব, করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে, শকুন্তলা আমাদের পিছন পিছন আসছে। স্বামী নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়ে দিলে মেয়েই বা কি করবে?

শার্ঙ্গরব—(রেগে পিছন ফিরে) এগিয়ে যাওয়া মেয়ে—কেন এরকম স্বাধীন ব্যবহার করছ? (শকুন্তলা ভয়ে কাঁপতে থাকে)—

যদি রাজা যা বলেছেন তাই হয় তাহলে কুলটা
তোমাকে নিয়ে বাবার কি হবে? আর নিজেকে
শুচি বলে জানলে স্বামীর বাড়ীতে তোমার
দাসীবৃত্তিও ভাল।

দাঁড়াও। আমরা যাচ্ছি।

রাজা—ও তপস্বী, কেন এঁকে ছলনা করছেন?

চাঁদ কুমুদকেই ফোটায়। সূর্য পদ্মকেই ফোটায়।
যাদের প্রবৃত্তি নিজের বশে তারা নিশ্চয়ই
পরের স্ত্রীর সংস্পর্শে আসে না।

শার্ঙ্গরব—যদি অন্য কাজে আগের ভালাবাসা ভুলে যেয়ে থাকেন তাহলে অধর্মের ভয়ে স্ত্রী ত্যাগ করা কেন?

রাজা—আপনাকেই এখান লঘুগুরু প্রশ্ন করি।—

আমার মোহ হয়েছে না এ মিথ্যা বলছে এই
যেখানে সন্দেহ, সেখানে স্ত্রী ত্যাগ করব না
পরের স্ত্রীর সংস্পর্শে এসে কলঙ্কিত হব ?

পুরোহিত—(বিচার করে) তা যদি হয় তা হলে এই করুন।

রাজা—আপনি আমাকে নির্দেশ দিন।

পুরোহিত—এই মহিলা প্রসব পর্যন্ত আমাদের বাড়ী থাকুন। কেন এ বলছি ? সাধুরা আগে আপনাকে বলেছেন প্রথমে আপনার চক্রবর্তী ছেলে হবে। সেই মুনির দৌহিত্রের যদি সেই সব লক্ষণ থাকে, তাহলে আমরা একে অভিনন্দিত করে রাজার ঘরে নেব। অন্য রকম হলে ওঁকে বাবার কাছে ফিরিয়েই দেয়া হবে।

রাজা—গুরুর যা অভিরুচি।

পুরোহিত—বাছা, আমাদের সঙ্গে এস।

শকুন্তলা—ভগবতী বসুমতী, আমাকে স্থান দাও। (কাঁদতে কাঁদতে বাইরে যায়, পুরোহিত আর তপস্বীরাও সঙ্গে বেরিয়ে যায়। শাপে রাজার স্মৃতিশক্তি চলে গিয়েছে। শকুন্তলার কথাই ভাবতে থাকেন)।

(নেপথ্যে)—আশ্চর্য্য—আশ্চর্য।

রাজা—(কান দিয়ে) কি হল ?

(প্রবেশ করে)

পুরোহিত—(বিস্ময়ের সাথে) প্রভু অদ্ভুত ব্যাপার হল।

রাজা—কিরকম ?

পুরোহিত—কণ্বের শিষ্যেরা ফিরে গেলে—

সেই মেয়ে নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করতে করতে
হাত উপরে তুলে কাঁদতে লাগল।

রাজা—তারপর ?

শকুন্তলা

শিল্পী : শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার
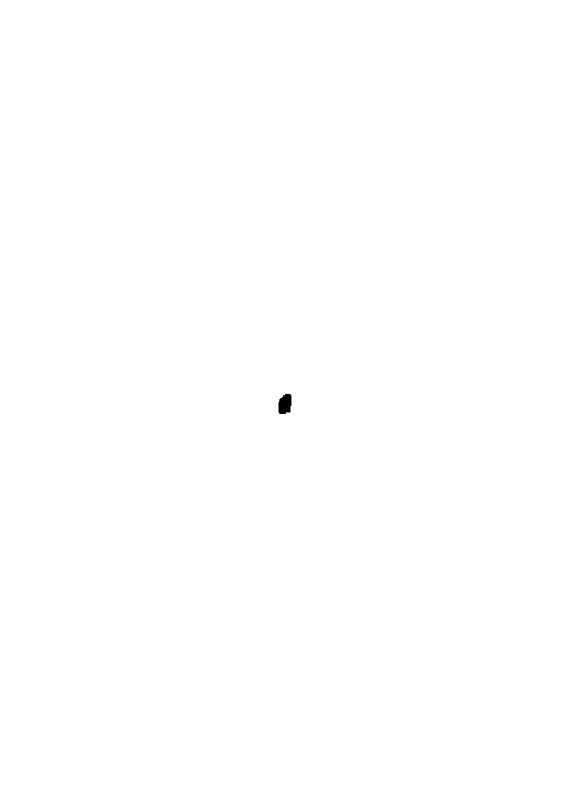
পুরোহিত—

স্ত্রীলোকের আকৃতি এক জ্যোতি অপ্সরাতীর্থের একটু দূর থেকে ওকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

(সবাই বিস্ময়ের অভিনয় করে)

রাজা—প্রথম থেকেই আমরা ওকে অস্বীকারই করেছি। বৃথা আলোচনা করে খুঁজে কি হবে? আপনি বিশ্রাম করুন।

পুরোহিত—(দেখে) জয় হোক। (বেরিয়ে যান)

রাজা—বেত্রবতী, আমি ব্যাকুল হয়েছি। শোবার ঘরের রাস্তা দেখাও।

প্রতিহারী—এদিকে, এদিকে প্রভু। (বেরিয়ে যায়)

রাজা—(খানিকটা হেঁটে নিজের মনে)—

মুনির মেয়েকে বিয়ে করার কথা মনে করতে পারছিনা সত্যি। তাকে ত্যাগ করা হয়েছে। মনে কিন্তু গভীর দুঃখ, যেন বিশ্বাসই হচ্ছে।

(সবাই বেরিয়ে যায়)

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রবেশক

(তারপর রাজার শালা আর দুজন রক্ষী হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে একজন লোককে নিয়ে প্রবেশ।)

রক্ষীরা—(লোকটিকে মারতে মারতে) ওরে চোর বল, তুই নামের অক্ষর খোদাই করা, দামী মণি জ্বলজ্বল করছে রাজার আংটিটা কোথায় পেলি ?

লোকটি—(ভয়ের অভিনয় করে) দয়া করুন পণ্ডিত মশাইরা, দয়া করুন। এরকম কাজ করার লোক আমি নই।

প্রথমরক্ষী—তুই সৎ ব্রাহ্মণ বলে কি রাজা তোকে দান করেছেন ?

লোকটি—এখন শুনুন। আমি জেলে, শক্রাবতারে থাকি।

দ্বিতীয়—ওরে চোর, তোকে কি আমরা জাত জিজ্ঞাসা করেছি ?

শালা—সূচক, ও ক্রমে ক্রমে সব বলুক। ওকে মাঝখানে থামিও না।

দুজনে—বোনাইয়ের যা আদেশ। বল।

লোক—আমি জাল, বঁড়শী—এই সব দিয়ে মাছ ধরে সংসার চালাই।

শালা—(হেসে) পেশাটা খুব ভালই।

লোক—প্রভু, এরকম বলবেন না।—

> নিন্দার হলেও যে কাজ নিয়ে লোক জন্মায়, সে
> কাজ ছাড়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণ দয়ালু হলেও
> পশু হত্যার মত ভয়ানক তাঁর কাজ।

শালা—তারপর ? তারপর ?

লোকটি—একদিন আমি রুইমাছ কেটে টুকরো টুকরো করছিলাম। তার পেটের ভিতরে যখন দেখি তখন মহারত্নে জ্বলজ্বলে এই আংটিটা নজরে পড়ল। তারপর এটা বিক্রির জন্যে দেখাচ্ছিলাম।

তখন পণ্ডিত মশাইরা ধরলেন। মারুন কিংবা কাটুন এটা আসার বৃত্তান্ত এই।

শালা—(আংটি শুঁকে) জানুক, গায়ে আঁশের গন্ধ, গোসাপ খেকো জেলেই সন্দেহ নেই। ওর আংটি দেখা বিচার করা উচিত। তাহলে আমরা রাজার বাড়ীতেই যাই।

রক্ষীরা—তাই হোক। (জেলেকে) চলরে গাঁটকাটা, চল। (এই বলে সবাই চলতে থাকে)

শালা—সূচক, এই নগরের দরজায় গোলমাল না করে আমার জন্যে অপেক্ষা কর। আমি ততক্ষণ এই আংটিটা যে ভাবে এসেছে প্রভুকে জানিয়ে আদেশ নিয়ে ফিরে আসি।

দুজনে—প্রভুর অনুগ্রহ নিতে ভিতরে যান বোনাই।

(শালা বেরিয়ে যায়)

সূচক—জানুক, বোনাই কিন্তু দেরি করছেন।

জানুক—রাজাদের কাছে অবসর মত যেতে হয়।

সূচক—ওকে বধ করার ফুল পরানোর জন্যে আমার হাত দুটোর ডগা নিসপিস করছে।

লোকটি—পণ্ডিতদের বিনা কারণে বধ করা উচিত নয়।

জানুক—(দেখে) এই যে আমাদের মালিক, রাজার আদেশ নিয়ে পত্র হাতে এদিকে দেখা যাচ্ছে। শকুনের বলি হবি, কুকুরের মুখও দেখতে পারিস।

(প্রবেশ করে)

শালা—তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি একে—(অর্ধেক বলে)

লোকটি—হায়রে, আমি মরলাম, (এই বলে দুঃখের অভিনয় করে)

শালা—এই জেলেকে ছেড়ে দাও। ওর আংটি পাওয়ার কথা সত্যিই।

সূচক—বোনাই যা বলেন।

জানুক—যমের বাড়ী যেয়ে ও ফিরে এল।

(এই বলে লোকটির বাঁধন খুলে দেয়)

লোকটি—এখন আমার রুজির কি হবে প্রভু ?

শালা—ওঠ, প্রভু এই আংটির দামের সমান পুরস্কারও দিয়েছেন।

(এই বলে লোকটিকে অর্থ দেয়।)

লোকটি—(আনন্দে প্রণাম করে গ্রহণ করে) আমি অনুগৃহীত হলাম প্রভু।

সূচক—এত অনুগ্রহ নিশ্চয়ই। কারণ শূল থেকে নামিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দেয়া হল।

জানুক—বোনাই, পুরস্কারে মনে হয়, দামী মণি বসানো আংটিটাকে প্রভু খুবই মূল্যবান মনে করতেন।

শালা—আমার মনে হয়, ওই দামী মণির জন্যে প্রভু খুব মূল্যবান মনে করেন না। ওটা দেখে প্রভুর কোন প্রিয়জনের কথা মনে হয়েছে। কারণ এমনিতে গম্ভীর হলেও মুহূর্তের জন্যে চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

সূচক—বোনাই কাজই করেছেন।

জানুক—বরং এই জেলে করেছে বল।

(এই বলে লোকটির দিকে হিংসার দৃষ্টিতে তাকায়)

লোকটি—কর্তা, এর অর্ধেক দিয়ে আপনাদের ফুলের দাম হোক।

জানুক—এই ঠিক।

শালা—জেলে তুই মহৎ। এখন আমার প্রিয়বন্ধু হলি। আমাদের প্রথম বন্ধুত্ব কাদম্বরী সাক্ষী করে হোক। তাহলে আমরা শুঁড়ির দোকানে যাই।

সবাই—তাই হোক। (সবাই বেরিয়ে যায়)

প্রবেশক শেষ

(তারপর আকাশ যানে করে সানুমতী নামে অপ্সরার প্রবেশ)

সানুমতী—সাধুদের স্নানের সময় অপ্সরাতীর্থের কাছে কাজের পালা

শেষ করে এলাম। এখন এই রাজর্ষির ব্যাপার দেখি। মেনকা সম্পর্কে শকুন্তলা আমার শরীরেরই অংশ হয়েছে। মেয়ের জন্য সেও আগে আমাকে বলেছে। (চারিদিকে দেখে) ঋতু উৎসব হলেও রাজবাড়ীতে আরম্ভটা যেন উৎসব নেই এরকম দেখাচ্ছে কেন? ধ্যানে সব জানার ক্ষমতা আমার আছে কিন্তু সখীর অনুরোধ আমার মানা উচিত। বেশ, এই উদ্যানপালিকা মেয়ে দুজনের পাশে তিরস্করণী বিদ্যায় অদৃশ্য হয়ে অপেক্ষা করি।

(এই বলে নামার অভিনয় করে দাঁড়ায়)

(তারপর আমের মুকুল দেখতে দেখতে দাসীর প্রবেশ। তার পিছন পিছন আর একজনও)

প্রথমা—

তামাটে, ফিকে শ্যামল, বসন্ত মাসের জীবনের সব
ঋতুমঙ্গল আমের মুকুল; তোমাকে দেখলাম,
তোমাকে প্রসাদ জানাই।

দ্বিতীয়া—পরভৃতিকা, একা একা কি করছিস?

প্রথমা—মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখলে পরভৃতিকা পাগল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়া—(আনন্দে তাড়াতাড়ি কাছে এসে) কি? মধুমাস এসে গিয়েছে?

প্রথমা—মধুকরিকা তোমার মদির গানের এই সময়।

দ্বিতীয়া—সখী আমি পায়ের অঙুলে ভর করে আমের মুকুল নিয়ে প্রেমের দেবতার পুজো করি। তুই আমাকে ধর।

প্রথমা—পুজোর ফলের অর্ধেক যদি আমার হয়।

দ্বিতীয়া—সখী না বললেও তাই হবে, কারণ আমাদের দেহ দুটো হলেও প্রাণ একটা। (সখীকে ধরে আমের মুকুল নিয়ে) ওরে সম্পূর্ণ না ফুটলেও আমের মুকুল ভাঙার মিষ্টি গন্ধ বের হচ্ছে। (এই বলে জোড় হাত করে)—

তুমি আমার আমের মুকুল। তোমায় দিলাম
ধনুক হাতে প্রেমের দেবতাকে। তুমি লক্ষ্য করো

পথিক মানুষের যুবতী বধুকে। পাঁচবাণের
সেরা বাণ হয়ো তুমি।

(এই বলে আমের মুকুল ফেলে দেয়)

(রেগে তাড়াতাড়ি ঢুকে)

কঞ্চুকী—নিজেকে জান না মেয়ে, ওরকম করোনা। প্রভু নিষেধ করা সত্ত্বেও বসন্ত উৎসবে আমের মুকুল ভাঙা সুরু করেছ ?

দুজনে—দয়া করুন, দয়া করুন আর্য। আমরা দুজনে ঘটনাটা জানতাম না।

কঞ্চুকী—তোমরা কি আগে শোননি যে বসন্তকালের গাছরাও প্রভুর শাসন মেনে চলেছে, এমনকি সে গাছের পাখীরাও ? কারণ—

আমের মুকুল অনেকদিন বের হলেও তার কেশর
বাঁধছেনা ; কুরুবক ফুটে উঠলেও কুঁড়িতেই রয়ে
গিয়েছে, শীত শেষ হয়েছে, তবুও পুরুষ
কোকিলের ডাক গলাতেই আটকে আছে ; মনে
হয়, প্রেমের দেবতাও ভয় পেয়ে বাণ তূন থেকে
অর্ধেক বের করে আবার টেনে নিয়েছেন।

সানুমতী—এতে সন্দেহ নেই। রাজর্ষির প্রচুর প্রভাব।

প্রথমা—আর্য, কয়েকদিন হল নগরপাল মিত্রাবসু আমাদের প্রভুর পায়ে পাঠিয়েছেন। এখানে আবার আমাদের দুজনকে প্রমোদবন পালনের কাজ দেয়া হয়েছে। সেই জন্যে আমরা নতুন এসেছি বলে এ খবর আগে শুনিনি।

কঞ্চুকী—বেশ, এরকম কাজ আর করোনা।

দুজনে—আর্য, আমাদের জানবার ইচ্ছে। যদি এই লোকদের শোনার মত হয়, তাহলে আপনি বলুন, প্রভু বসন্ত উৎসবকে নিষেধ করেছেন কেন ?

সানুমতী—মানুষ উৎসব ভালবাসে। তাহলে এর গুরুতর কারণই আছে।

কঞ্চুকী—এত বহু লোক জানে, না বলার কি? কেন শকুন্তলাকে ফিরিয়ে দেবার জনশ্রুতি তোমাদের কানে আসেনি?

দুজনে—নগরপালের কাছে আংটি দেখা পর্যন্ত শোনা আছে।

কঞ্চুকী—তাহলে অল্পই বলার আছে। যখনই নিজের আংটি দেখে আগে গোপনে সত্যিই বিয়ে করার কথা মনে পড়েছে; মাননীয়া শকুন্তলাকে মোহে পড়ে ফিরিয়ে দেবার জন্যে তখন থেকেই প্রভুর অনুশোচনা সুরু হয়েছে। যেমন—

সুন্দর জিনিস দেখতে পারেন না; আগের মত
রোজ প্রজাদের সেবা করেন না; বিছানায়
এপাশ ওপাশ করে, না ঘুমিয়েই রাত কাটান;
অনুগ্রহ করে যখন অন্তঃপুরের লোকদের সাথে
ঠিকমত কথা বলেন, তখন আবার নাম ভুল করে,
লজ্জায়, বিস্ময়ে অনেক্ষণ দেরি করেন।

সানুমতী—মিষ্টি আমার কাছে মিষ্টি।

কঞ্চুকী—এতবেশি মন খারাপের জন্যে উৎসব নিষেধ করা হয়েছে।

দুজনে—ঠিক হয়েছে।

নেপথ্যে—এদিকে, এদিকে প্রভু।

কঞ্চুকী—(কান দিয়ে) ওহো, প্রভু এদিকে আসছেন। নিজের কাজ কর।

দুজনে—আপনার যা আদেশ। (বেরিয়ে যায়)

(তারপর অনুশোচনার উপযুক্ত পোষাকে রাজা, বিদূষক আর প্রতীহারীর প্রবেশ।)

(রাজাকে দেখে)

কঞ্চুকী—আহা, গড়ন সুন্দর হলে সব অবস্থায়ই সুন্দর দেখায়। এই উদ্বেগ তবুও দেখতে প্রভুকে সুন্দর! কারণ—

বিশেষ আভরণ সবই ছেড়েছেন। বাঁ হাতে
কব্জির উপর কেবল একটা জলজলে সোনার

[illegible]

[illegible] একটুও রোগা দেখায় না—

মহামণিকে পালিশ করলে যেমন হয়, তেমনি।

সানুমতী—(রাজাকে দেখে) ফিরিয়ে দেয়াতে অপমানিতা হয়েছে তবুও ওঁকে না পেয়ে শকুন্তলার দুঃখ হয় ঠিকই।

রাজা—(চিন্তায় আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে)—

মৃগনয়না প্রিয়া, জাগিয়ে দিলেও আগে ঘুমিয়েছে
এই পোড়া মন, দুঃখে আর অনুশোচনায় এখন
জেগে আছে।

সানুমতী—সে বেচারারও কপাল এই রকম।

বিদূষক—(জনান্তিকে) আবার ওঁকে শকুন্তলা ব্যারাম ধরেছে। কি করে যে চিকিৎসা হবে জানি না।

কঞ্চুকী—(কাছে এসে) জয় হোক, জয় হোক প্রভু। প্রভু প্রমোদবন ভাল করে পরীক্ষা করা হয়েছে। আনন্দ করার জায়গায় খুশিমত বসতে পারেন প্রভু।

রাজা—বেত্রবতী, আমার কথায় মন্ত্রী আর্যপিশুনকে বল, দেরী করে জেগেছি বলে আজ আমার ধর্মাসনে বসা সম্ভব নয়। যে সমস্ত পৌরকাজ আর্য পরীক্ষা করেছেন সেগুলো পত্র লিখে যেন পাঠিয়ে দেন।

প্রতীহারী—প্রভুর যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

রাজা—বাতায়ন, তুমিও নিজের কাজ কর।

কঞ্চুকী—প্রভুর যা আদেশ। (এই বলে বেরিয়ে যায়)

বিদূষক—মাছিটিও তাড়িয়েছেন, এখন শীত আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সুন্দর সময়। এই প্রমোদ বনে আনন্দ করুন।

রাজা—(নিশ্বাস ফেলে) বন্ধু, কথা আছে, রন্ধ্র দিয়ে অনর্থ ঢোকে। সে কথায় ভুল নেই। দেখ—

যে অন্ধকার মুনির মেয়ের সাথে ভালবাসার স্মৃতি

ঢেকে রেখেছিল তা থেকে এই মন ছাড়া পেল,
আর বন্ধু, প্রেমের দেবতা ধনুকে আমের মুকুলের
বাণ পরালেন আঘাত করবেন বলে।

বিদূষক—বন্ধু, একটু দাঁড়াও। আমি ততক্ষণ এই ডাণ্ডা দিয়ে কন্দর্পের বাণ ধ্বংস করি। (এই বলে ডাণ্ডা উঠিয়ে আমের মুকুল ভাঙার চেষ্টা করে)

রাজা—(হেসে) বেশ, ব্রাহ্মণের তেজ দেখা গেল। এখন কোথায় বসলে খানিকটা প্রিয়ার মত লতার দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়োই।

বিদূষক—কেন? আসন্ন পরিচারিকা চতুরিকাকে আপনি আদেশ করেছেন "এ বেলা মাধবীকুঞ্জে কাটাব। সেখানে আমার নিজের হাতে আঁকা চিত্রফলকে মাননীয়া শকুন্তলার ছবি নিয়ে এস।"

রাজা—মন ভাল করার এইরকম জায়গা। তাহলে সেই রাস্তাই দেখাও।

বিদূষক—এ দিকে আসুন আপনি, এদিকে। (দুজনে যেতে থাকেন। সানুমতী পিছন পিছন যায়) এই মনিবসানো পাথরের বেদী দিয়ে সাজানো মাধবীকুঞ্জ। যেন সুন্দর উপহার দিয়ে ও স্বাগত করে আমাদের ডাকছে। তাহলে ঢুকে আপনি বসুন।

(দুজনে ঢুকে বসে)

সানুমতী—লতার সাথে থেকে এখন প্রিয়সখীর ছবি দেখব। তারপর তাকে স্বামীর বহুমুখী ভালবাসার কথা বলব। (সেইভাবে অপেক্ষা করে)

রাজা—(নিশ্বাস ফেলে) বন্ধু, এখন শকুন্তলার আগেকার কথা সব মনে পড়ছে। তোমাকে বলেছি ত। যখন ফিরিয়ে দিলাম তখন তুমি আমার কাছে ছিলে না। কিন্তু আগেও তুমি কখনো তার নাম করোনি। আমার মত তুমিও কি ভুলে গিয়েছিলে?

বিদূষক—ভুলিনি। কিন্তু সব বলে শেষে আপনি বলেছিলেন

যে, এ পরিহাস করে বলা, আসল কথা নয়। আমিও মোটা বুদ্ধি, তাই মেনে নিয়েছি। না কি, এখানে অদৃষ্টেরই ক্ষমতা বেশি।

সানুমতী—ঠিক তাই।

রাজা—(একটু ভেবে) বন্ধু, আমাকে বাঁচাও।

বিদূষক—আরে! এ কিরকম। এ আপনার অনুপযুক্ত। ভাল লোকরা কখনো শোক নিয়ে বসে থাকে না। পর্বত ঝড়েও কাঁপেনা।

রাজা—বন্ধু, তাড়িয়ে দেয়াতে বিহ্বল প্রিয়ার মনের অবস্থা কল্পনা করে কোন ভরসাই পাচ্ছি না। সে কিন্তু—

এখান থেকে ফিরিয়ে দেয়াতে নিজের লোকদের
সাথে যেতে চেয়েছিল। গুরুর শিষ্য, সে গুরুরই
মত, জোর করে বলল, "থাক—সে দাঁড়াল, জলে
ভেজা ঝাপসা চোখে নিষ্ঠুর আমার দিকে আবার
তাকাল, এসব যেন বিষ মাখানো শেল,—আমি
জ্বলছি।

সানুমতী—মাগো। স্বার্থপরতা এই রকম। ওঁর দুঃখে আমার আনন্দ।

বিদূষক—শোন, আমার মনে হয় আকাশচারী কেউ ওঁকে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—বন্ধু, স্বামী তার দেবতা। তাকে অন্যে ছুঁতে সাহস করবে? তোমার সখীর মা মেনকা বলে শুনেছি। আমার মনে ভয় সে কিংবা তার সখীরা ওকে নিয়ে গিয়েছে।

সানুমতী—ভুলে যাওয়াটাই আশ্চর্য, মনে পড়া নয়।

বিদূষক—যদি তাই হয় তাহলে আপনার ভরসা পাওয়া উচিত। সময়ে তাঁর সাথে মিলন হবে।

রাজা—কি করে?

বিদূষক—বাপ-মা স্বামীর সাথে মেয়ের বিচ্ছেদের দুঃখ বেশি দিন দেখতে পারেন না।

রাজা—বন্ধু—

এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মনের ভুল, না
পুণ্যের ফল শেষ হয়ে যাওয়া ? যা ফিরে
আসবে না, তা গতই হয়েছে। মনের আশা,
যেন ভেঙে পড়ছে এমন নদীর কূল।

বিদূষক—তা নয়, আংটিটাই এখানে প্রমাণ, উনি অভাবনীয় ভাবেই এসে পড়বেন নিশ্চয়।

রাজা—(আংটি দেখে) ওহো, এটা এমন জায়গা থেকে পড়ে গিয়েছে যে জায়গা সহজে পাওয়া যায় না। দুঃখের কথা।—

আংটি ! তোমার পুণ্য আমার মতই অল্প।
ফলে তা বোঝা যায়। তার আঙুল তাতে
সুন্দর লাল নখ, সেখানে জায়গা পেয়ে পড়ে
গেলে।

সানুমতী—যদি আর কারও হাতে যেত তাহলে সত্যিই দুঃখের কথা হত।

বিদূষক—এই নাম লেখা আংটি আপনি ওঁর হাতে কেন পরিয়েছিলেন।

সানুমতী—আমার যে কৌতূহল তা ওরও হয়েছে।

রাজা—শোন, নিজের নগরে ফেরার সময় প্রিয়া আমাকে ভেজা গলায় বলল "আর্যপুত্র কতদিনে খবর পাঠাবে ?"

বিদূষক—তারপর ? তারপর ?

রাজা—তখন এই আংটি তার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে আমি উত্তর দিয়েছিলাম—

"দিনে দিনে আমার নামের একটি করে
অক্ষর গুণো, শেষ হতে হতেই প্রিয়া আমার
অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার কাছে লোক
আসবে।"

আর নিষ্ঠুর আমি মোহে পড়ে তা করিনি।

সানুমতী—সুন্দর সীমা। বিধি বাম হল।

বিদূষক—কিন্তু যে রুই মাছটাকে জেলে কাটল তার পেটের ভিতরে কি করে এল ?

রাজা—তোমার সখী যখন শচীতীর্থে স্নান করছিল, তখন তার হাত থেকে গঙ্গার স্রোতে পড়ে গিয়েছে।

বিদূষক—ঠিক।

সানুমতী—রাজর্ষির অধর্মে ভয়। সেই জন্যেই তার বেচারা শকুন্তলার সঙ্গে বিয়েতে সন্দেহ ছিল। তাছাড়া এইরকম ভালবাসা অভিজ্ঞানের জন্যে অপেক্ষা করে, এ আবার কি রকম ?

রাজা—এখন এই আংটিকে বকব।

বিদূষক—(নিজের মনে) এইবার উনি পাগলামি সুরু করেছেন।

রাজা—

কোমল বন্ধুর আঙুল ছেড়ে কি করে জলে
পড়লি ? না কি যার জ্ঞান নেই সে নিশ্চয়ই গুণ
দেখে না। আমি বা কি করে প্রিয়াকে ভুলে
গেলাম।

বিদূষক—(নিজের মনে) খিদে কি আমাকে খেয়ে ফেলবে ?

রাজা—অকারণে ত্যাগকরা মেয়ে। অনুশোচনায় তপ্ত মন এই মানুষকে দয়া কর, আবার দেখা দাও।

(পর্দা তুলে চিত্রফলক হাতে প্রবেশ করে)

চতুরিকা—প্রভু, এই যে ছবিতে ভট্টিনী।

(এই বলে চিত্রফলক দেখায়)

বিদূষক—(দেখে) বন্ধু, বেশ। ভাবের প্রকাশ সুন্দর ফুটেছে; দেখার মত হয়েছে। উঁচু-নীচু জায়গায় আমার দৃষ্টি যেন পিছলে যাচ্ছে। বেশি বলে কি হবে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে ভেবে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করছে।

সানুমতী—ওমা, রাজর্ষির এত নিপুণতা, মনে হচ্ছে যেন প্রিয়সখী আমার সামনে।

রাজা—

ছবিতে যেগুলো ভাল হয়নি, সেগুলো অন্যরকম
করছি, তবুও তার লাবণ্যরেখায় কিছু ফুটেছে।

সানুমতী—অনুশোচনায় ভালবাসা আরও বেশি হয়েছে, গর্বও নেই। এ তারই উপযুক্ত।

বিদূষক—শুনুন, এখানে তিন জন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। সবাই দেখার মত। তাহলে এর ভিতরে কোন মহিলা শকুন্তলা?

সানুমতী—এমন রূপ যে লোক জানেনা, তার দৃষ্টি বৃথা।

রাজা—আচ্ছা, তুমি কাকে মনে কর?

বিদূষক—(ভাল করে দেখে) আমার মনে হয়, জল দেয়াতে ভেজা কচিপাতাওয়ালা আমগাছের পাশে একটু পরিশ্রান্ত, এইভাবে যিনি আঁকা; চুলের শেষ দিকটায় ফুলের বাঁধন শিথিল, হাত দুটো বেশ ঝুলে পড়েছে, মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, তিনিই মাননীয়া শকুন্তলা। অন্য দুজনে সখী।

রাজা—তুমি নিপুণ। এখানে আমার ভাবেরও চিহ্ন আছে।—

ঘামে ভেজা আঙুল লাগাতে ছবির পাশে ময়লা
দেখাচ্ছে। এই যে রঙ ফুলে উঠেছে এখানে গাল
দিয়ে ঝরে পড়া চোখের জল দেখা যাচ্ছে।

(দাসীর দিকে) চতুরিকা, এই আনন্দের জায়গা অর্ধেক আঁকা হয়েছে। এখন যাও তুলি নিয়ে এস।

চতুরিকা—আর্য মাধব্য, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত চিত্রফলকটা ধরুন।

রাজা—আমি নিজেই এটা ধরছি। (যা বললেন তাই করেন)

(দাসী বেরিয়ে যায়)

রাজা—(নিশ্বাস ফেলে)—

প্রিয়া নিজে এসেছিল তাকে আমি আগে ফিরিয়ে
দিয়েছি। এখন ছবিতে আঁকা এ আমার বড়
আদরের। পথে নদীর প্রচুর জল ফেলে এসে বন্ধু
এখন মরীচিকার প্রেমে পড়েছি।

বিদূষক—(নিজের মনে) উনি এই নদী কেলে এসেছেন।- এখন মরীচিকায় পেয়েছে। (প্রকাশ্যে) শুনুন, এখানে আর কি আঁকতে হবে ?

সানুমতী—যে যে জায়গা আমার প্রিয়সখীর পছন্দ সেই সেই জায়গা আঁকতে ইচ্ছে হয়েছে হবে।

রাজা—বন্ধু শোন—

বালুচরে হংসমিথুন ; মালিনী নদী আঁকব, পবিত্র
হিমালয়ের পায়ের পাশে হরিণরা বসে আছে
আঁকব। আর আঁকতে ইচ্ছে করছে গাছের ডাল
থেকে ঝোলানো বল্কলের নিচে হরিণী, কালো
হরিণের শিঙে বাঁ চোখ ঘষছে।

বিদূষক—(নিজের মনে) আমি দেখছি উনি গোটা চিত্রফলকটাই গুচ্ছের লম্বাদাড়ি তপস্বী দিয়ে ভরে ফেলবেন।

রাজা—বন্ধু, আরও আছে। শকুন্তলার প্রিয় প্রসাধন আমরা এখানে ভুলে গিয়েছি।

বিদূষক—কি রকম ?

সানুমতী—বনবাসের আর রূপের সাথে যা মানায় সেই রকম হবে।

রাজা—বন্ধু—

গাল পর্যন্ত কেশর ঝুলে পড়া শিরীষ, কানে
লাগান—তা আঁকিনি, স্তনের মাঝে শরৎকালের
চাঁদের মত নরম মৃণালের মালা, তাও আঁকিনি।

বিদূষক—শোন, কিন্তু এই মহিলা, লাল পাতার মত হাতের সামনেটা দিয়ে মুখটা আড়াল করে যেন খুব ভয় পেয়েছেন এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? (ভালভাবে দেখে) আঃ, এই দাসীর ছেলে ফুলের মধুচোর মৌমাছি এই মহিলার পদ্মের মত মুখটা আক্রমণ করছে।

রাজা—এই বেয়াদবকে নিষেধ কর।

বিদূষক—বেয়াদবের শাসন করেন আপনি, আপনার নিষেধ শুনবে।

রাজা—ঠিক, ওহে ফুলের লতার আদরের অতিথি, এখানে ঘুরে ঘুরে দুঃখ করছ কেন ?—

তোমাকে ভালবাসে এই মৌমাছি মেয়ে ফুলে
লেগে আছে, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।
তৃষ্ণা পেলেও সে তোমাকে ছাড়া মধু খায় না।

সানুমতী—একে ভদ্রভাবেই এখন বারণ করা হয়েছে।

বিদূষক—নিষেধ করলেও এ জাত উল্টোদিকে যায়।

রাজা—ওরে, তুই আমার শাসন শুনছিস না, তাহলে শোন এখন—

ছোট কচি নতুন পাতার মত লোভনীয় আমার
প্রিয়ার অধর, যেন বিম্বফল, প্রেমের উৎসবে
আমি আদর করেই পান করেছি। মৌমাছি,
সেই অধর যদি তুই ছুঁবি, তাহলে তোকে পদ্ম
ফুলের পেটে বন্দী করাব।

বিদূষক—এইরকম কঠিন শাস্তিকে ও কেন ভয় করছে না ? (হেসে আত্মগত) এ এখন পাগল, আমিও ওর সাথে এই রকমই হয়েছি। (প্রকাশ্যে) শুনুন, এত ছবি।

রাজা—কি ? ছবি ?

সানুমতী—আমিই এখুনি বুঝতে পারলাম। যেমন আঁকা রয়েছে, তাই অনুভব করছে—এর আর কথা কি ?

রাজা—বন্ধু, এ অনিষ্ট করলে কেন ?—

তন্ময়মনে দেখার সুখ অনুভব করছিলাম, যেন
প্রিয়া সামনেই রয়েছে। তুমি মনে করিয়ে দিয়ে
প্রিয়াকে আমার ছবি বানিয়ে দিলে।

(চোখের জল ফেলতে থাকে)

সানুমতী—এই বিরহের পথ অপূর্ব। আগের কিংবা পরের সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই।

রাজা—এ রকম অবিশ্রান্ত দুঃখ কি করে ভোগ করব বন্ধু ?—
জেগে থাকি বলে স্বপ্নে তার আসা বন্ধ। ছবিতে
আঁকলেও চোখের জল ওকে দেখতে দেয় না।

সানুমতী—ফিরিয়ে দেয়াতে শকুন্তলার যে দুঃখ তা তুমি পুরোপুরিই শোধ করে দিয়েছ।

চতুরিকা—(প্রবেশ করে) জয় হোক, জয় হোক প্রভু। তুলি বাক্স নিয়ে এ দিকেই আসছিলাম।

রাজা—তারপর ?

চতুরিকা—পথে দেবী বসুমতী—"আমিই আর্যপুত্রের কাছে নিয়ে যাচ্ছি" এই বলে জোর করে আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। দেবী বসুমতীর সাথে তরলিকা ছিল।

বিদূষক—কপালগুণে তুমি ছাড়া পেয়েছ।

চতুরিকা—দেবীর উত্তরীয় গাছে আটকে গিয়েছিল। তরলিকা যখন সেটা ছাড়াচ্ছিল তখন আমি পালিয়েছি।

রাজা—বন্ধু, অনেক মানে গরবিণী এই দেবী, এসে পড়েছেন, তা এই ছবিটা তুমি রক্ষা কর।

বিদূষক—বলুন নিজেকেও। (চিত্র ফলক নিয়ে উঠে) যদি আপনি অন্তঃপুরের কঠিন জাল থেকে ছাড়া পান তাহলে আমাকে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ থেকে ডাকবেন। এটাও আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব, যেখানে এক পায়রা ছাড়া কেউ দেখতে পাবে না।

(এই বলে তাড়াতাড়ি চলে যায়)

সানুমতী—ওমা, মন অন্যকে দিয়েছেন, ভালবাসা এঁর শিথিল তবুও আগেকার খাতির রাখছেন।

(পত্র হাতে প্রবেশ করে)

প্রতীহারী—জয় হোক, জয় হোক প্রভু।

রাজা—বেত্রবতী, তুমি রাস্তায় দেবীকে দেখনি ?

প্রতীহারী—হ্যাঁ, আমাকে চিঠি হাতে দেখে ফিরে গিয়েছেন।

রাজা—কাজের কথা জানেন। তাইতে আমার কাজের অসুবিধা করেন না।

প্রতীহারী—প্রভু, মন্ত্রী জানাচ্ছেন, আজ আর্থিক গণনা বেশি থাকাতে রাজকার্য একটাই পরীক্ষা করা হয়েছে। পত্রে লেখা আছে, প্রভু সেটা দেখুন।

রাজা—এদিকে পত্রটা দেখাও (প্রতীহারী কাছে নিয়ে আসে)

রাজা—(পড়ে) কি? ধনমিত্র সমুদ্রপথে ব্যবসা করেন, তিনি জাহাজডুবি হয়ে মারা গিয়েছেন। বেচারার ছেলেপিলে নেই। তাঁর জমানো সম্পত্তি রাজা পাবেন, অমাত্য এই লিখেছেন। (দুঃখের সাথে) বেত্রবতী, ছেলে না থাকা সত্যিই কষ্ট। অনেক টাকা ছিল তাইতে ভদ্র লোকের অনেক স্ত্রীও থাকার কথা। দেখ, স্ত্রীদের ভিতরে কেউ সন্তানসম্ভবা আছে কিনা?

প্রতীহারী—প্রভু, শোনা যাচ্ছে, ওঁর স্ত্রী অযোধ্যার বণিকের মেয়ের পুংসবন ইদানীং হয়েছে।

রাজা—বাবার সম্পত্তি গর্ভের সেই ছেলেরই প্রাপ্য। যাও, মন্ত্রীকে এই বল।

প্রতীহারী—প্রভুর যা আদেশ। (বেরিয়ে যায়)

রাজা—তাহলে এস।

প্রতীহারী—(ফিরে এসে) আমি এখানে।

রাজা—সন্তান থাকুক আর না থাকুক তাতে কি?—

> ঘোষণা কর, পাপীরা ছাড়া অন্য যাদের যে যে
> ভালবাসার বন্ধুর অভাব হবে, দুষ্মন্তই তাদের
> সেই বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতীহারী—এ নিশ্চয়ই ঘোষণা করা হবে। (বেরিয়ে যায় আবার প্রবেশ করে।) সময়ে বৃষ্টির মত প্রভুর ঘোষণা অভিনন্দিত হয়েছে।

রাজা—(উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে), হায়রে, সন্তান না থাকলে, অবলম্বন থাকে না। তখন মূল পুরুষ মারা গেলে সম্পত্তি পরের হাতে যায়। আমিও যখন মারা যাব তখন পুরুবংশের শ্রীর এই অবস্থা হবে।

প্রতীহারী—অমঙ্গল দূর হোক।

রাজা—ভাগ্য কাছে এসেছিল, তাকে অপমান করেছি। আমাকে ধিক।

সানুমতী—সন্দেহ নেই প্রিয়সখীকে মনে করেই নিজেকে এইভাবে নিন্দা করছেন।

রাজা—

ধর্মস্ত্রীতে নিজের বীজ বুনেছি। সে স্ত্রী
বংশের প্রতিষ্ঠা। ঠিক সময়ে বীজ বুনে প্রচুর
ফসল পাবার যখন আশা, সেই সময় সেই ক্ষেত
ত্যাগ করার মতই সে স্ত্রী আমি ত্যাগ করেছি।

সানুমতী—তোমার সন্তান এখন আর তোমাকে ছাড়া থাকবে না।

চতুরিকা—(জনান্তিকে) এই বণিকের বৃত্তান্ত শুনে প্রভুর উদ্বেগ দ্বিগুণ হয়ে গেল। ওঁকে সুস্থ করার জন্যে আর্য মাধব্যকে মেঘ প্রতিচ্ছন্দ থেকে নিয়ে এস।

প্রতীহারী—ঠিক বলেছ।

(বেরিয়ে যায়)

রাজা—আহা, দুষ্মন্তের পিণ্ড যাঁরা নেন তাঁরা সন্দেহে বিচলিত।—

আমার পরে আমাদের বংশে বেদে যেমন বলা
হয়েছে সেইভাবে আর কে জলপিণ্ড দেবে?
আমার সন্তান নেই। আমার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই
চোখের জল ধুয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, আমার
দেয়া জলের সেইটুকুই খান।

(অজ্ঞান হয়ে যান)

চতুরিকা—(সম্ভ্রমের সাথে ধরে) শান্ত হোন, শান্ত হোন প্রভু।

সানুমতী—হায়, হায়, ছি ছি, প্রদীপ থাকলেও আড়াল বলে উনি অন্ধকার দেখছেন। আমি শুনেছি, শকুন্তলাকে আশ্বাস দিতে দিতে ইন্দ্রের মা বলেছেন—যজ্ঞের ভাগ পেতে উৎসুক দেবতারা এমন বন্দোবস্ত করছেন যাতে শিগ্‌গিরই ধর্মপত্নীকে স্বামী

অভিনন্দন জানাবেন। তাহলে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত। ততক্ষণ এই খবর দিয়ে প্রিয়সখীকে আশ্বাস দিই।

(এই বলে উদ্‌ভ্রান্তক ভঙ্গি করে বেরিয়ে যায়)

নেপথ্যে—ব্রাহ্মণের বিপদ, ব্রাহ্মণের বিপদ।

রাজা—(জ্ঞান ফিরে আসে, কান দিয়ে) অ্যাঁ, মাধব্যের আর্তনাদ বলে মনে হয়। কে—কে আছ এখানে ?

(প্রবেশ করে)

প্রতীহারী—(সসম্ভ্রমে) বন্ধু বিপদে পড়েছেন। প্রভু উদ্ধার করুন।

রাজা—আমুদে বেচারা। তাকে আবার কে ?

প্রতীহারী—অদৃশ্য কোন জীব মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদ ছাড়িয়ে উপরে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—(তাড়াতাড়ি) না, না—আমার বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব, নাকি—
নিজেরই দৈনন্দিন ভুলত্রুটি সব বুঝতে পারি না,
প্রজাদের ভিতরে কে কোন্ পথে চলেছে, তা
ভাল করে জানার ক্ষমতা কোথায় ?

নেপথ্যে—বন্ধু গো—হায় ! হায় !

রাজা—(শুনে থেমে চল্‌তে চল্‌তে) ভয় পেয়োনা বন্ধু, ভয় পেয়োনা।

নেপথ্যে—(আবার সেই ভাবে) ভয় না পাব কি করে ? এখানে একজন আমাকে মাথা পিছন দিকে বাঁকিয়ে আখের মত তিন বাঁকা করে দিচ্ছে।

রাজা—(তাকিয়ে) ধনুক, ধনুক। (ধনুক হাতে প্রবেশ করে)

যবনী—জয় হোক, জয় হোক প্রভু। এই ধনুকবাণ আর দস্তানা।

(রাজা বাণশুদ্ধ ধনুক নেন)

নেপথ্যে—গলার তাজা রক্তে আমার লোভ, তুই ধড়ফড়
করতে থাকবি, আর বাঘে যেরকম পশু হত্যা
করে সেই রকমই তোকে আমি এখন হত্যা করব।
বিপন্নের ভয় দূর করার জন্যে দুষ্মন্ত ধনুক ধরেছে ;
সেই এখন তোর আশ্রয় হোক।

রাজা—(রেগে) কি ? আমাকেই উপলক্ষ করছে ? দাঁড়া, দাঁড়ারে মড়াখেকো, এবার আর তুই বাঁচবিনা। (ধনুকে গুণ দিয়ে)

বেত্রবতী—সিঁড়ির রাস্তা দেখাও।

প্রতীহারী—এদিকে, এদিকে প্রভু। (সবাই তাড়াতাড়ি কাছে যায়)

রাজা—(চারিদিকে দেখে) আরে কিছু নেই ত।

নেপথ্যে—হায়। হায়। আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমি যেন বিড়ালের খপ্পরে ইঁদুর, আমার বাঁচার আশা নেই।

রাজা—ওরে, অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা জানিস বলে তোর গর্ব। আমার অস্ত্র তোকে দেখতে পাবে। এই আমি সেই বাণ লক্ষ্য করছি—

হাঁস যেরকম মিশানো থাকলেও জল ফেলে দুধ
নেয়, সেই রকম যাকে বধ করার তাকে বধ
করবে আর যে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করার তাকে রক্ষা
করবে। (এই বলে অস্ত্র জোড়েন)

(তারপর মাতলি আর বিদূষকের প্রবেশ)

মাতলি—আয়ুষ্মান—

আপনার বাণ মারার জন্যে ইন্দ্র অসুরদের ঠিক
করেছেন। এখন ধনুক তাদের দিকেই ফেরান।
ভাল লোকদের প্রসন্ন দৃষ্টিই বন্ধুদের উপরে পড়ে;
ভীষণ বাণ নয়।

রাজা—(সসম্ভ্রমে অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে নিতে) ও মাতলি, ইন্দ্রের সারথি, স্বাগত।

বিদূষক—আমাকে যে যজ্ঞের পশুর মত হত্যা করছিল তাকে উনি স্বাগত বলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

মাতলি—(হেসে) আয়ুষ্মান, শুনুন, ইন্দ্র কেন আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

রাজা—শুনছি।

মাতলি—দুর্জয় বলে কালনেমির সন্তান একদল দানব আছে।

রাজা—আছে, আমি নারদের কাছে আগে শুনেছি।

মাতলি—

আপনার বন্ধু ইন্দ্র তাদের জয় করতে পারেন না।
আপনি সম্মুখ যুদ্ধে তাদের সংহার করবেন বলে
ঠিক হয়েছে। রাত্রির যে অন্ধকার সূর্য দূর করতে
পারে না, চন্দ্র তাকে দূর করে।

অস্ত্র আপনার হাতেই রয়েছে। এখন সেই ইন্দ্রের রথে উঠে জয়যাত্রা করুন।

রাজা—ইন্দ্রের এই সম্মানে আমি অনুগৃহীত হয়েছি। কিন্তু আপনি মাধব্যের উপরে এরকম করলেন কেন?

মাতলি—(হেসে) তাও বলছি। কোন কারণে মন খারাপ বলে আয়ুষ্মাণকে আমি অসুস্থ দেখেছিলাম, তাইতে আয়ুষ্মাণকে রাগিয়ে দেবার জন্যে আমি এরকম করেছি।

কারণ—

জ্বালানি নাড়িয়ে দিলে আগুন জোরে জ্বলে,
রাগিয়ে দিলে সাপ ফণা ধরে। প্রাণীদেরও রেগে
গেলে প্রায়ই নিজের মহিমা প্রকাশ পায়।

রাজা—(বিদূষককে) বন্ধু, ইন্দ্রের আদেশ অমান্য করা যায় না। তাইতে যাও, ব্যাপারটা বুঝিয়ে আমার কথায় মন্ত্রী পিশুনকে বল—

তোমার বুদ্ধিই কেবল এখন প্রজা পালন করুক।
এই ধনুক এখন অন্য কাজে ব্যস্ত।

বিদূষক—প্রভুর যা আদেশ।

(বেরিয়ে যায়)

মাতলি—আয়ুষ্মান, রথে উঠুন।

(রাজা রথে ওঠার অভিনয় করেন)

(সবাই বেরিয়ে যায়)

সপ্তম অঙ্ক

(তারপর রথে চড়ে আকাশ পথে রাজা আর মাতলির প্রবেশ)

রাজা—মাতলি, ইন্দ্রের নির্দেশ যদিও পালন করেছি, তবুও তিনি যে ভাল ব্যবহার করেছেন নিজেকে তার অনুপযুক্ত মনে হচ্ছে।

মাতলিল—(হেসে) আয়ুষ্মান, দুজনেই এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট বলে জানবেন।—

সম্মানের দরুন, ইন্দ্রের যে উপকার আগে করেছেন
তাকে আপনি ছোট ভাবছেন। আপনার
অবদানে অবাক হয়ে তিনিও একে সম্মান বলেই
মনে করছেন না।

রাজা—মাতলি না, তা নয়। বিদায়ের সময়ের সম্মান, সে মনের আশারও অনেক বেশি।—

সামনে জয়ন্ত (ইন্দ্রের ছেলে) তারও মনে
আকাঙ্ক্ষা, তার দিকে তাকিয়ে নিজের গলায়
ঝোলান মন্দারমালা, তাতে হরিচন্দন মাখানো
দেবতাদের সামনে আমার গলায় পরিয়ে দিলন,
ইন্দ্রের আসনের অর্ধেকে আমি বসে।

মাতলি—স্বর্গের রাজার কাছে আয়ুষ্মান কি না পেতে পারেন।—

সুখ ভালবাসেন ইন্দ্র, তাঁর স্বর্গ, সেখানকার
কাঁটা দৈত্যদের উৎখাত করেছেন দুজন। পুরা-
কালের নৃসিংহের নখ আর এখন আপনার
গিঁটগুলো পালিশ করা বাণ।

রাজা—এখানেও ইন্দ্রের মহিমারই প্রশংসা করা উচিত।—

যাকে নিয়োগ করা হয়েছে, বড় কাজেও সে
সফল হয়, তাও যে নিয়োগ করেছে সে যে
পিছনে আছে তার গুণ বলে জানবেন। সূর্য
যদি সামনে না রাখতেন তাহলে কি অরুণ
অন্ধকার দূর করতে পারত ?

মাতলি—এ আপনারই উপযুক্ত (অল্প দূর যেয়ে) এখানে দেখুন, স্বর্গের উপরে আপনার খ্যাতির সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত।—

স্বর্গের সুন্দরীদের প্রসাধনের পর অবশিষ্ট রঙ্
দিয়ে দেবতারা কল্পলতার বাকলে গান গাওয়া যায়
এইভাবে গুছিয়ে আপনার কীর্তির কথা লিখছেন।

রাজা—মাতলি, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে উৎসুক ছিলাম বলে আগের দিন স্বর্গে উঠবার সময় এ দিকটা লক্ষ্য করিনি। এখন আমরা বায়ুমণ্ডলের কোথায় আছি ?

মাতলি—

প্রবাহ বায়ুর এই পথ। হরির দ্বিতীয় পা ফেলাতে
পবিত্র। আকাশের ত্রিস্রোতাকে বইতে হয় বলে
এতে ধুলো নেই। আলো ঠিকমত ভাগ করে নিয়ে
এখানে জ্যোতিষ্করা থাকে।

রাজা—মাতলি, এতে সত্যি আমার ভিতরে আর বাইরে, আমার অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়েছে। (রথের চাকার দিকে তাকিয়ে) মনে হয়, আমরা মেঘের এলাকায় নেমে এসেছি।

মাতলি—আয়ুষ্মান, কি করে বুঝলেন ?

রাজা—

ওই চাকার ফাঁক দিয়ে চাতকরা যাচ্ছে,
ঘোড়াদের গায়ে বিদ্যুতের ঝলক, রথের চাকা
জলের ফোঁটায় ভেজা, মনে হয় যেন আপনার
রথ জলভরা মেঘের উপর দিয়ে চলেছে।

মাতলি—তা ছাড়া আর কি ? এখুনি আয়ুষ্মান নিজের রাজ্যে পৌঁছে যাবেন।

রাজা—(নীচে তাকিয়ে) মাতলি তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়াতে মানুষদের এলাকা অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

কারণ—

পাহাড়গুলো উঁচু হয়ে যাওয়াতে পৃথিবী যেন
পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে যাচ্ছে। গুঁড়ি দেখা
যাওয়াতে গাছের পাতায় মোরা ভাব চলে যাচ্ছে।
জলছাড়া ক্ষীণদেহ নদীগুলো চওড়া হয়ে যাওয়াতে
নিজেকে প্রকাশ করছে। দেখ, কে যেন
পৃথিবীটাকে তুলে আমার দিকে নিয়ে আসছে।

মাতলি—আয়ুষ্মান, বেশ দেখেছেন। (ভালভাবে দেখে) আহা, বড় সুন্দর এই পৃথিবী।

রাজা—মাতলি, পূব সমুদ্র থেকে যেয়ে পশ্চিম সমুদ্রে নেমেছে, সোনালী রস গড়িয়ে পড়ছে, সন্ধ্যার মেঘের টুকরোর মত দেখাচ্ছে এটা কোন পর্বত ?

মাতলি—আয়ুষ্মান, এটা হল হেমকূট নামে কিন্নরদের পর্বত, তপস্বীদের সেরা জায়গা। দেখুন—

দেবতা আর অসুরদের গুরু প্রজাপতি এখানে
স্ত্রীর সঙ্গে তপস্যা করছেন, তিনি ব্রহ্মার ছেলে
মরীচের সন্তান।

রাজা—(শ্রদ্ধার সাথে) তাহলে শ্রেয়কে ডিঙিয়ে যেতে নেই। ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই।

মাতলি—আয়ুষ্মান ভাল কথা। (দুজনে নামার অভিনয় করে)

রাজা—(বিস্ময়ের সাথে)—মাতলি—

মাটি ছোঁয়নি বলে রথের চাকা কোন শব্দ
করেনি। সামনে কোন ধুলোও দেখা যাচ্ছেনা। রথ
আপনার ফাঁকি দেয়না—নামলেও বোঝা যায় না।

মাতলি—আপনার আর ইন্দ্রের ভিতরে এইটুকুনই তফাৎ।
রাজা—মাতলি, মারীচের আশ্রম কোন্ দিকটায়?
মাতলি—(হাত দিয়ে দেখাতে দেখাতে) দেখুন—

যেখানে স্থাণুর মত অচল ওই মুনি সূর্যের
দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, শরীরের অর্ধেকটা উই
ঢিপিতে ঢেকে গিয়েছে, বুকে সাপের খোলস
লেগে আছে, গলায় শুকনো লতার আঁকড়ি কঠিন
ভাবে জড়িয়ে আছে, কাঁধ পর্যন্ত জটা নেমে
এসেছে, তাতে পাখীর বাসা হয়েছে।

রাজা—(দেখে) কৃচ্ছ্রসাধক নমস্কার।
মাতলি—(রথের রাশ টেনে) এই মন্দার গাছ অদিতি পেলেছেন। আমরা ছুজনে এখন প্রজাপতির আশ্রমে ঢুকলাম।
রাজা—আঃ, এখানে স্বর্গের চাইতেও বেশি শান্তি, আমি যেন অমৃতের হ্রদে ডুবে আছি।
মাতলি—(রথ থামিয়ে) আয়ুষ্মান নামুন।
রাজা—(নেমে) মাতলি, আপনি এখন কি করবেন?
মাতলি—রথটা আমি থামিয়ে দিলাম, তাহলে আমিও নামব। (তাই করে) এদিকে, এদিকে আয়ুষ্মান। (যেয়ে) মাননীয় ঋষিদের তপোবন দেখুন।
রাজা—দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।—

বনে কল্পতরু আছে, সেখানে হাওয়া খেয়ে প্রাণ
রক্ষা করা, সোনালী পদ্মের রেণুতে লালচে জল,
তাতে পুণ্যস্নান, মণিবসানো পাথরের বাড়ীতে
ধ্যান; কাছাকাছি স্বর্গের মেয়েরা, সেখানে সংযম।
অন্য মুনিরা যার জন্যে তপস্যা করেন, তার
ভিতরে থেকে উনি তপস্যা করছেন।

মাতলি—যাঁরা মহৎ, তাঁদের আশা উঁচু। (খানিকটা যেয়ে আকাশে) ও বৃদ্ধ শাকল্য, ভগবান মারীচ এখন কি করছেন? (শুনে) কি

বললেন ? দাক্ষায়ণী পতিব্রতা ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁকে আর অন্য মহর্ষিদের স্ত্রীদের তাই বলছেন ?

রাজা—(কান দিয়ে) ওহো, বিষয়টা এমন যে অপেক্ষা করা উচিত।

মাতলি—(রাজাকে দেখে) আপনি ওই অশোক গাছের নিচে অপেক্ষা করুন, আমি ততক্ষণ ইন্দ্রের গুরুকে নিবেদন করার সুযোগ খুঁজি।

রাজা—আপনি যা মনে করেন। (এই বলে দাঁড়ান, মাতলি বেরিয়ে যায়।)

রাজা—(সুলক্ষণের অভিনয় করে)—

মনের আশা পূর্ণ হবার ভরসা নেই। হাত মিথ্যেই
নড়ছে। মঙ্গলকে আগেই ফিরিয়ে দিয়েছি,
এখন দুঃখই অবশিষ্ট আছে।

নেপথ্যে—না, দুষ্টুমি করোনা, কি ? আবার নিজের স্বভাব ফিরে পেয়েছো ?

রাজা—(কান দিয়ে) দুষ্টুমির ত এ জায়গা নয়—তা হলে কে এভাবে নিষেধ করছে ? (যে দিক থেকে শব্দ আসছে সেদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে) আহা, তাপসীরা আটকে রাখছে, সাধারণ শিশুর মত নয়, এ শিশু কে ?—

সিংহের বাচ্চাটার মায়ের দুধ অর্ধেক খাওয়া হয়েছে
তার কেশর দলে মুচড়ে খারাপ হয়ে গিয়েছে,
তাকে খেলার জন্যে গায়ের জোরে টানছে।

(তারপর যেমন বলা হয়েছে সেই রকম করতে করতে তাপসীদের সাথে বালকের প্রবেশ)

বালক—হাঁ কর সিংহের বাচ্চা, হাঁ কর, তোর দাঁত গুণব।

প্রথমা—দুষ্টু, আমাদের ছেলের মত জন্তুদের উপর অত্যাচার করছ কেন ? উঃ, তোমার দুষ্টুমি বেড়ে চলেছে, ঋষিরা যে তোমার নাম সর্বদমন দিয়েছেন ঠিক হয়েছে।

রাজা—এই ছেলেটি দেখে আমার মন নিজের ছেলেতে যেমন হয়

সেই রকম নরম হয়ে উঠছে কেন? (ভেবে) নিশ্চয়ই ছেলে নেই বলে আমার বাৎসল্য এসেছে।

দ্বিতীয়া—ওর বাচ্চাকে ছেড়ে না দিলে এই সিংহিনী তোমাকে তাড়া করবে।

বালক—(হেসে) মাগো, আমি বেজায় ভয় পেয়েছি।

(এই বলে ঠোঁট দেখায়)

রাজা—(আশ্চর্য হয়ে)—

মনে হয় এই শিশুর ভিতরে আছে মহান্ তেজের বীজ। স্ফুলিঙ্গ আছে, আগুন শুধু জ্বালানির অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রথমা—এই সিংহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও বাছা, তোমাকে অন্য খেলনা দেব।

বালক—কোথায়? তাই দাও।

(এই বলে হাত বাড়ায়)

রাজা—(শিশুর হাত দেখে) কিরকম? ওর চক্রবর্তীর লক্ষণও রয়েছে।

কারণ ওর—

চাওয়া জিনিসের লোভে মেলে দেয়া হাত জ্বলজ্বল করছে। জাল দিয়ে গাঁথা আঙুলগুলো, যেন পাঁপড়িগুলোর ফাঁক দেখা যাচ্ছে না এমন একটি পদ্ম, নতুন উষার ঝলমলে রঙে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয়া—সুব্রতা, কেবল কথা দিয়ে একে ঠেকানো যাবেনা। তা যাও। আমার পাতার ঘরে ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের রঙীন মাটির ময়ুর আছে, সেটা ওকে দাও।

প্রথমা—বেশ। (বেরিয়ে যায়)

বালক—ততক্ষণ ওর সঙ্গেই খেলা করব।

(এই বলে তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে)

রাজা—এই দুষ্টুটাকে বেশ লাগছে। (নিঃশ্বাস ফেলে)—

ছেলের আধ আধ কথা বলার চেষ্টায় আর অকারণ হাসিতে দাঁতগুলো সামান্য উঠেছে দেখা যায়। সে ছেলে ভালবেসে কোলে আশ্রয় নেয়, তাকে যে তুলে নেয়, তার গায়ের ধুলোয় যার গা নোংরা হয়, তার অনেক পুণ্য।

তাপসী—(আঙুল দেখিয়ে ধমকে) ওরে আমাকে গ্রাহ্য করছিস না? (পাশে দেখে) ঋষিকুমারদের কে এখানে আছ? (রাজাকে দেখে) ভদ্রমুখ শুনুন, এই সিংহের বাচ্চাটাকে খেলার ছলে জোর করে ধরে রেখেছে, ছাড়ান শক্ত, ওকে একটু ছাড়িয়ে দিন।

রাজা—বেশ, (এই বলে কাছে যেয়ে একটু হেসে)—ওহে মহর্ষির ছেলে,—

তোমার বাবা সংযমী, তোমার এরকম আশ্রম ছাড়া ব্যবহার কেন? কাল সাপের বাচ্চা থাকলে চন্দন যেরকম খারাপ হয়ে যায়, সেই রকম এতে নিজের ভিতরকার গুণও নষ্ট হয়ে যায়।

তাপসী—ভদ্রমুখ, এ কিন্তু ঋষির ছেলে নয়।

রাজা—ওর গড়ন আর সেই রকম কাজকর্মতে তাই মনে হয়। কিন্তু জায়গাটা ভেবেই আমি এইরকম মনে করেছিলাম। (যেরকম অনুরোধ, সেই রকম করতে করতে শিশুর স্পর্শ অনুভব করে, নিজের মনে)—

কার যেন বংশের এ অঙ্কুর। ওর গা ছুঁয়েই আমার এত সুখ। যার দেহ থেকে এ জন্ম নিয়েছে, না জানি তার কত আনন্দ।

তাপসী—(দুজনকে ভাল করে দেখে) আশ্চর্য, আশ্চর্য!

রাজা—আর্যা, কিরকম?

তাপসী—এই শিশুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও আপনার

চেহারার সাথে মিল দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। স্বভাবে ও দুরন্ত, কিন্তু আপনি অপরিচিত হলেও গোলমাল করছেনা।

রাজা—(বাচ্চাকে আদর করতে করতে) আর্যা, যদি ও মুনির ছেলে না হয় তাহলে ওর কোন বংশ ?

তাপসী—পুরুবংশ।

রাজা—(স্বগত) কিরকম ? আমাদের একই বংশ। সেই জন্যেই এই মহিলা একে আমার মত দেখতে বলে ভাবছেন। (প্রকাশ্যে) পুরুবংশের কুলব্রতের শেষটা এই রকম।—

আগে পৃথিবী রক্ষা করার জন্যে নানা রসে ভরা
বাড়ীতে যারা থাকে, পরে যখন সন্ন্যাসীর ব্রত
নেয় তখন গাছের তলাই তাদের বাসা হয়।

কিন্তু মানুষ ত নিজের ইচ্ছায় এখানে আসতে পারে না।

তাপসী—ভদ্রমুখ, যা বলেছেন। কিন্তু অপ্সরার সঙ্গে সম্পর্ক থাকাতে এই শিশুর মা দেবগুরুর এই আশ্রমে প্রসব করেছেন।

রাজা—(নিজের মনে) আঃ, আশা করার দ্বিতীয় যুক্তি। (প্রকাশ্যে) তাহলে সেই মাননীয়া মহিলা কোন রাজার স্ত্রী ?

তাপসী—ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করেছে তার নাম নেবার কথা কে ভাবে ?

রাজা—(নিজের মনে) একথা নিশ্চয়ই আমাকেই লক্ষ্য করে। (চিন্তা করে) তাই যদি হয় তাহলে বাচ্চার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি। না কি পরের স্ত্রীর আলোচনা করা আর্যের ব্যবহার নয়।

(মাটির ময়ুর হাতে প্রবেশ করে)

তাপসী—সর্বদমন শকুন্তলাবণ্য দেখ।

(শকুন্ত অর্থ পাখী—অনুবাদক)

বালক—(তাকিয়ে) আমার মা কোথায় ?

(দুজনেই হাসতে থাকে)

প্রথমা—মাকে ভালবাসে, নামের মিল দেখে ঠকেছে।

দ্বিতীয়া—বাছা, এই মাটির ময়ুরটা কি সুন্দর দেখ। এই বলা হয়েছে।

রাজা—(নিজের মনে) কি ? ওর মায়ের নাম শকুন্তলা ? আবার

নামের মিলও থাকে। না কি এই কথা মরীচিকার মত আমার দুঃখেরই জন্যে।

বালক—দিদি, এই মাটির ময়ূরটা আমার পছন্দ হয়েছে। (খেলনাটা নেয়)

প্রথমা—মাগো, ওর কব্জীতে রক্ষা কবচটা দেখছি না।

রাজা—আর্যা ব্যস্ত হবেন না। সিংহের ছানার সাথে হুটোপাটি করার সময় নিশ্চয়ই পড়ে গিয়েছে। (তুলতে যায়)

দুজনে—না না...। এটা ধরে··· । কি ? ইনি ধরেছেন ? (আশ্চর্য হয়ে বুকে হাত দিয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

রাজা—আমাকে নিষেধ করা হল কেন ?

প্রথমা—মহারাজ শুনুন। এটা দেবতাদের মহৌষধ অপরাজিতা। এর প্রভাব খুব। এই ছেলের জাতকর্মের সময় ভগবান মারীচ দিয়েছেন। এটা মাটিতে পড়লে মা-বাবা আর নিজে ছাড়া আর কেউ ধরে না।

রাজা—যদি ধরে।

প্রথমা—তাহলে তাকে সাপ হয়ে কামড়াবে।

রাজা—আপনারা কখন এর এই বিকার দেখেছেন ?

দুজনে—অনেকবার।

রাজা—(আনন্দের সাথে নিজের মনে) পূর্ণই যখন হল তখন মনের আশাকে অভিনন্দন জানাবো না কেন ? (এই বলে বালককে আদর করতে থাকেন)

দ্বিতীয়া—সুব্রতা এস। শকুন্তলা নিয়ম পালন করছে। তাকে এই ব্যাপার বলি। (দুজনে বেরিয়ে যায়)

বালক—আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মায়ের কাছে যাব।

রাজা—আমার ছেলে। আমার সাথেই মাকে অভিনন্দন জানাবে।

বালক—আমার বাবা দুষ্যন্ত। তুমি নও।

রাজা—(হেসে) এই ঝগড়ায় আমার আরও বিশ্বাস হল।

(তারপর একটি বেণীবাঁধা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা—(চিন্তা করতে করতে) বিকার হবার সময়ও সর্বদমনের গাছড়া ঠিক ছিল শুনেও আমার নিজের ভাগ্যের উপর কোন ভরসা ছিল না। না কি, সানুমতী যে রকম বলেছে, এ হতেও পারে।

(চলতে থাকে)

রাজা—(শকুন্তলাকে দেখে আনন্দে আর দুঃখে) আহা, এই সেই মাননীয়া শকুন্তলা।—

পরণে ধূলো মাখা কাপড়, ব্রত পালন করে
মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, একটি বেণীবাঁধা, অতি
অকরুণ আমার দীর্ঘ বিরহ, শুদ্ধভাবে পালন
করছে।

শকুন্তলা—(অনুশোচনায় বিবর্ণ রাজাকে দেখে ভাবতে ভাবতে) আর্যপুত্রের মত ঠিক নয়, তাহলে কে এ এখন রক্ষাকবচ পরা আমার ছেলেকে গায়ের ছোঁয়ায় অশুচি করছে!

বালক—(মার কাছে যেয়ে) মা, এ কে একটি লোক আমাকে ছেলে বলে আদর করে জড়িয়ে ধরছে।

রাজা—প্রিয়া, আমি তোমার সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু ফল তার ভাল হয়েছে। তাইতে আমার এখন ইচ্ছে, তুমি আমাকে চিনতে পার।

শকুন্তলা—(নিজের মনে) মন, ভরসা কর। ভরসা কর। বিপদ পেরিয়ে এসে এখন দৈব আমাকে দয়া করেছে। ইনি আর্যপুত্রই।

রাজা—প্রিয়া—

সুন্দর তোমার মুখ, কপালগুণে মোহ কেটে
গিয়েছে, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাহু
গিয়েছে, চাঁদের রোহিণীর সাথে মিলন হয়েছে।

শকুন্তলা—জয় হোক, জয় হোক আর্যপুত্র, (অর্ধেক বলে ভেজা গলায় থেমে যায়)

রাজা—সুন্দরী—

কান্নায় আটকে গেলেও জয় শব্দে আমি জিতেছি। কারণ, প্রসাধন ছাড়াই লালচে তোমার ঠোঁট, সে মুখ আমি দেখেছি।

বালক—এ কে মা ?

শকুন্তলা—তোর কপালকে জিজ্ঞাসা কর বাছা, (কাঁদতে থাকে)

রাজা—

সুন্দরী মেয়ে, ফিরিয়ে দেবার দুঃখ মন থেকে সরিয়ে দাও। আমার মনের উপর তখন কি যেন একটা বিরাট মোহ এসে পড়েছিল। গভীর যাদের মোহ, তাদের প্রায়ই এরকম হয়। অন্ধ সাপ ভেবে মাথায় দেয়া মালাও ফেলে দেয়।

(এই বলে পায়ে পড়ে।)

শকুন্তলা—উঠুন আর্যপুত্র, উঠুন। আমার আগের কোন কাজের ফল নিশ্চয়ই ভাল কাজের বাধা হয়ে সে দিন পেকে উঠেছিল। সেই জন্যে এমনিতে দয়ালু হলেও আর্যপুত্র ওইরকম করেছিলেন।

(রাজা ওঠেন)

শকুন্তলা—তারপর এই দুঃখীকে আর্যপুত্রের কি করে মনে পড়ল ?

রাজা—দুঃখের কাঁটা তুলে নিয়ে তবে বলব।—

সুন্দরী মেয়ে, চোখের জল তোমার অধরের উপরে এসেছিল, মোহে আগে অবহেলা করেছি। প্রিয়া, আজ তোমার অধরের বাঁকা পাঁপড়ির উপরে তাই ঝুলছে। সেটা মুছে দি আমার অনুশোচনা চলে যাক।

(যে রকম বলা হল তাই করে)

শকুন্তলা—(চোখ মোছার পর আংটি দেখে) আর্যপুত্র এই সেই আংটি ?

রাজোদ্যানে দুষ্যন্ত, শকুন্তলা ও সর্বদমন

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে 'শকুন্তলার হিন্দী' অনুবাদের সচিত্র পাণ্ডুলিপি থেকে

রাজধানী অভিমুখে দুষ্যন্ত, শকুন্তলা ও সর্বদমন

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে "শকুন্তলার মিলন" [illegible] সচিত্র পাণ্ডুলিপি থেকে

রাজা—হ্যাঁ, অদ্ভুতভাবে এই আংটিটা পেয়ে আমার স্মৃতি ফিরে এসেছে।

শকুন্তলা—এটা বড় অন্যায় করেছে। কারণ আর্যপুত্রকে বিশ্বাস করানোর সময় এটা পাওয়া যায়নি।

রাজা—তাহলে ঋতুর সাথে মিলনের প্রমাণ হিসাবে লতার সাথে ফুলের মিলন হোক।

শকুন্তলা—আমি ওকে বিশ্বাস করিনা। আর্যপুত্রই এটা পরুন।

(তারপর মাতলির প্রবেশ)

মাতলি—কপালগুণে ধর্মস্ত্রী আসাতে আর ছেলের মুখ দেখাতে আয়ুষ্মাণের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

রাজা—আমার মনের আশার মিষ্টি ফল হয়েছে।

মাতলি—ইন্দ্র এ ব্যাপার জানেন না ?

মাতলি (হেসে) দেবতাদের না জানা কি আছে ? এদিকে আসুন আয়ুষ্মান। ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শন দেবেন।

রাজা—প্রিয়া, ছেলেকে নাও। তোমাকে সামনে রেখে ভগবানকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

শকুন্তলা—আর্যপুত্রের সাথে গুরুজনের কাছে যেতে লজ্জা করছে।

রাজা—শুভ কাজে এ করা যায়। এস, এস। (এই বলে সবাই হাঁটতে থাকে)

(তারপর অদিতির সাথে আসনে বসা মারীচের প্রবেশ)

মারীচ—(রাজাকে দেখে) দাক্ষায়ণী—

যুদ্ধের সামনে এ প্রথমে থাকে। পৃথিবীর রাজা,
নাম দুষ্মন্ত। ওর ধনুকেই সব কাজ হয়ে
যাওয়াতে সেরা বজ্র ইন্দ্রের শুধু আভরণ।

অদিতি—এর চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

মাতলি—আয়ুষ্মান। ছেলেকে ভালবাসার মত দৃষ্টিতে এই যে দেবতাদের বাবা, মা আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাহলে কাছে যান।

তাতে ছায়া দেখা যায়না। কিন্তু পরিষ্কার করলে ভাল দেখা যায়।

রাজা—ভগবান যা বলেন।

মারীচ—বাছা, শকুন্তলার এই ছেলেকে অভিনন্দন জানিয়েছো ত? এর জাতকর্ম সব আমি বিধিমত করেছি।

রাজা—ভগবান, আমার বংশের প্রতিষ্ঠা এখানেই।

(এই বলে শিশুর হাত ধরে)

মারীচ—মনে রেখ, এ তাই হবে আর রাজচক্রবর্তীও হবে।—
রথ এর কেউ আটকাতে পারবে না। তার গতি না কমিয়েই সমুদ্র পার হয়েও অল্পদিনেই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করবে। এখানে জোর করে জন্তুদের জয় করেছে বলে এ সর্বদমন। লোককে ভরণ করবে বলে এর নাম হবে ভরত।

রাজা—ভগবান যখন সংস্কার করেছেন, এ সবই আমরা আশা করি।

অদিতি—ভগবান, তার মেয়ের মনের আশা পূর্ণ হয়েছে, কণ্বের কাছে এ খবর পৌঁছে দেয়া উচিত। মেনকা মেয়েকে ভালবাসে, সে আমার কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শকুন্তলা—(নিজের মনে) ভগবতী, আমার মনের কথাই বলেছেন।

মারীচ—তপস্যার প্রভাবে তিনি সবই জানেন।

রাজা—তাহলে মুনি আমার উপরে খুব রাগ করেননি।

মারীচ—তাহলেও আমাদের তাঁকে এই ভাল খবরটা দেয়া উচিত। কে, কে আছ এখানে?

(প্রবেশ করে)

শিষ্য—আমি এখানে ভগবান।

মারীচ—গালব, এখুনি উড়ে যাও। আমার কথায় মাননীয় কণ্বকে এই ভাল খবরটা দাও যে, শাপ শেষ হয়ে যাওয়াতে দুষ্মন্তের স্মৃতি ফিরে এসেছে। তিনি শকুন্তলাকে আর তার ছেলেকে গ্রহণ করেছেন।

শিষ্য—ভগবানের যা আদেশ।

(বেরিয়ে যায়)

মারীচ—বাছা, তুমিও বউ, ছেলে নিয়ে বন্ধু ইন্দ্রের রথে উঠে তোমার রাজধানীতে ফিরে যাও।

রাজা—(প্রণাম করে) ভগবানের যা আদেশ।

মারীচ—

ইন্দ্র তোমাদের প্রজাদের প্রচুর বর্ষণ দান করুন। তুমিও প্রচুর যজ্ঞ করে স্বর্গের ভালবাসা লাভ কর। এই রকম পরস্পরের কাজ শতযুগ ধরে করে তুমি স্বর্গে, মর্তে গর্ব করার মত অনুগ্রহ লাভ কর।

রাজা—ভগবান, যতদূর সম্ভব ভালই করতে চেষ্টা করব।

মারীচ—বাছা, তোমাকে আর কি প্রিয় উপহার দেব ?

রাজা—এর চাইতেও ভাল আর কি আছে ? তাহলে এই হোক।

—ভরত বাক্য—

রাজা প্রজাদের উপকার করুন। বেদজ্ঞদের বাক্য মহান্ হোক, আর স্বয়ম্ভূ সর্বশক্তিমান মহাদেব আমারও পুনর্জন্ম বন্ধ করুন।

(সবাই বেরিয়ে যায়)

॥ পরিশিষ্ট ॥

শ্লোক উদ্ধৃতি

প্রস্তাবনা

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ ।
যামাহুঃ সর্বভূতপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥

—স্রগ্ধরা ছন্দ

অনুবাদ, ১৭ পৃষ্ঠায় ২—৮ পঙক্তি

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংসর্গসুরভিবনবাতাঃ ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ১৮ পৃষ্ঠায় ৫—৭ পঙক্তি

ঈসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং ।
ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসকুসুমাইং ॥

—গীতি ছন্দ

অনুবাদ, ১৮ পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙক্তি

প্রথম অঙ্ক

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্বকায়ম্ ।
দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি ॥

—স্রগ্ধরা ছন্দ

অনুবাদ, ১৯ পৃষ্ঠায় ৯—১৬ পংক্তি

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ২০ পৃষ্ঠায় ১—৫ পংক্তি

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাম্
যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্
ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ ॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ২০ পৃষ্ঠায় ৭—১১ পংক্তি

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ ।

বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাস্
তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ২২ পৃষ্ঠায়, ৩—৯ পঙক্তি

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥

—মালিনী ছন্দ।

অনুবাদ, ২৪ পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙক্তি

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ২৪ পৃষ্ঠায় ১৯-২১ পঙক্তি

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশোবেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥

—শিখরিণী ছন্দ।

অনুবাদ, ২৫ পৃষ্ঠায় ১৯—২৪ পঙক্তি

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাৎ
অদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।

বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূর্ধজাঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠায় ১০—১৫ পঙক্তি

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠায় ১—৪ পঙক্তি

তীব্রাঘাতপ্রতিহততরুস্কন্ধলগ্নৈকদন্তঃ
ক্রীড়াকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্ন সারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ ॥

—মন্দাক্রান্তা ছন্দ

অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠায় ৮–১৬ পঙক্তি

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মা গা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা সখী
সর্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী স্বতাং পশ্যতি ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৩৪ পৃষ্ঠায় ৯—১৪ পঙক্তি

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো ধনুরিদমাহিতসায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ॥

—পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ

অনুবাদ, ৩৫ পৃষ্ঠায় ৬—৮ পঙক্তি

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিস্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে
বিশ্রামং লভতামিদঞ্চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ॥

—শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৩৬ পৃষ্ঠায় ২৩—২৭ পঙক্তি

সুরযুবতিসম্ভবং কিল মুনেরপত্যং তদুজ্‌ঝিতাধিগতম্।
অর্কস্যোপরি শিথিলং চ্যুতমিব নবমল্লিকাকুসুমম্॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৩৭ পৃষ্ঠায় ২৮ এবং ৩৮ পৃষ্ঠায় ১—২ পঙক্তি।

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠায় ৯—১৩ পঙক্তি

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠায় ১৬—২০ পঙক্তি

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ॥

—দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ

অনুবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠায় ২৭—২৮ এবং ৩৯ পৃষ্ঠায় ১—২ পঙক্তি

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ ৩৯ পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙক্তি

কৃত্যয়োর্ভিন্নদেশত্বাদ্ দ্বৈধীভবতি মে মনঃ।
পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ স্রোতোবহো যথা॥

—শ্লোক ছন্দ

অনুবাদ, ৪২ পৃষ্ঠায় ৭—৯ পঙক্তি

তৃতীয় অঙ্ক

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্
দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ুখৈস্
ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥

—মালিনী ছন্দ

৪৪ পৃষ্ঠায় ১—৪ পঙক্তি

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গানাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ॥

—আর্যা ছন্দ।

অনুবাদ, ৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮—২০ পঙক্তি

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োঃ
নতু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৪৫ পৃষ্ঠায় ১৩—১৬ পঙক্তি

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী।

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৪৬ পৃষ্ঠায় ৯—১৪ পঙক্তি

স্মর এব তাপহেতোর্নির্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৪৭ পৃষ্ঠায় ৪—৬ পঙক্তি

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্‌বিবর্ণমণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রবর্তিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে॥

—হরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৪৮ পৃষ্ঠায় ১—৬ পঙক্তি

অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো
বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্।

লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং
শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতোভবেৎ ॥

—বংশস্থবিল ছন্দ

অনুবাদ, ৪৮ পৃষ্ঠায় ১৭—২১ পঙক্তি

উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ।
কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥

— আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৪৮ পৃষ্ঠায় ২৬—২৮ পঙক্তি

তুজ্‌ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি।
ণিগ্‌ ঘিণ তবই বলীঅং তুহ বুত্তমনোরহাইং অঙ্গাইং ॥

উদ্‌গাথা ছন্দ

অনুবাদ, ৪৯ পৃষ্ঠায় ৯—১২ পঙক্তি

অপরিক্ষতকোমলস্য তাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য।

—মালভারিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৫২ পৃষ্ঠায় ৪—৬ পঙক্তি

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম।
মুখমংসবিবর্তিপক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু ॥

—মালভারিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৫৩ পৃষ্ঠায় ৩—৬ পঙক্তি

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরর্পিতঃ।

হস্তাদ্ ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্জমানেক্ষণে
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাদীশোঽস্মি শূন্যাদপি ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িতছন্দ

অনুবাদ, ৫৩ পৃষ্ঠায় ৯—১৪ পঙক্তি

চতুর্থ অঙ্ক

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকোনিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৫৬ পৃষ্ঠায় ২৪—২৭ পঙক্তি

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৫৭ পৃষ্ঠায় ২—৫ পঙক্তি

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈর্
দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৬০ পৃষ্ঠায় ১৩—১৮ পঙক্তি

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠস্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্ ।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৬১ পৃষ্ঠায় ২—৬ পংক্তি

অমী বেদিং পরিতঃ ক্লৃপ্তধিষ্ণ্যাঃ
সমিদ্বন্তঃ প্রান্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্যগন্ধৈঃ
বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥

—প্রথম ও তৃতীয় চরণ বাতোর্মী ছন্দ

—দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ শালিনী ছন্দ

অনুবাদ, ৬১ পৃষ্ঠায় ২২—২৪ পংক্তি

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ।

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৬২ পৃষ্ঠায় ৫—১০ পংক্তি

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৬২ পৃষ্ঠায় ১৬—১৯ পংক্তি

উগ্‌গলিঅদব্‌ভকবলা মিই পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী ।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্‌সূ বিঅ লদাও ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৬২ পৃষ্ঠায় ২৮ পঙক্তি এবং ৬৩ পৃষ্ঠায় ১—২ পঙক্তি

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে ।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৬৪ পৃষ্ঠায় ২—৫ পঙক্তি

এসা বি পিএণ বিণা গমেই রঅণিং বিসাঅদীহঅরং ।
গরুঅং বিরহদুক্‌খং আসাবন্ধো সহাবেদি ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৬৪ পৃষ্ঠায় ২৬—২৮ পঙক্তি

অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে
বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা ।
তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং
মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ॥

—হরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৬৬ পৃষ্ঠায় ৫—৯ পঙক্তি

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সম্প্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ॥

—ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ

অনুবাদ, ৬৭ পৃষ্ঠায় ২১—২৪ পঙক্তি

পঞ্চম অঙ্ক

অহিণবমহুললুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চুঅমঞ্জরিং ।
কমলবসইমেত্তনিব্বুদো মহুঅর বিস্মুমরিদোসি ণং কহং ॥

—অপরবক্ত্র ছন্দ

অনুবাদ, ৬৮ পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙক্তি

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৬৯ পৃষ্ঠায় ৩—৬ পঙক্তি

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে ।
তথাপীদং শশ্বৎপরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৭১ পৃষ্ঠায় ২৭-২৮ এবং ৭২ পৃষ্ঠায় ১—৪ পঙক্তি

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্ ।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৭২ পৃষ্ঠায় ৬—১২ পঙক্তি

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৭৩ পৃষ্ঠায় ২—৪ পঙক্তি

ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমাএ ণ তুএ বি পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কস্স চ চরিএ ভণাহু কিং এক্ক এক্কস্সিং ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৭৪ পৃষ্ঠায় ১২—১৫ পঙক্তি

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্

—মালিনী ছন্দ

অনুবাদ, ৭৫ পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙক্তি

ময্যেব বিস্মরণদারুণ চিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্‌ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৭৮ পৃষ্ঠায় ৬—১১ পঙক্তি

কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্।
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মাং হৃদয়ম্ ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৮১ পৃষ্ঠায় ১২—১৪ পঙক্তি

ষষ্ঠ অঙ্ক

সহজে কিল বিনিন্দিএ ণহু দে কম্ম বিবজ্জণীঅএ।
পশুমালণকম্মদালুণে অণুকম্পামিদুঅ বি শোত্তিএ॥

সুন্দরী ছন্দ, মতান্তরে বৈতালীয় ছন্দ
অনুবাদ, ৮২ পৃষ্ঠায় ১৮—২০ পংক্তি

আতম্মহরিঅপণ্ডুর বসন্তমাসস্ জীঅসব্বস্স।
দিট্ঠোসি চূঅকোরোঅ উদুমঙ্গল তুমং পসাএমি॥

—আর্যা ছন্দ
অনুবাদ, ৮৫ পৃষ্ঠায় ১২—১৪ পংক্তি

তুংসি মএ চূদঙ্কুর দিন্নোকামস্স গহীদ ধনু অস্স।
পহিঅজণ জুবইলক্খো পঞ্চ্ বভহিঅ সরো হোহি॥

—আর্যা ছন্দ
অনুবাদ, ৮৫ পৃষ্ঠায় ২৭—২৮ এবং ৮৬ পৃষ্ঠায় ১—২ পংক্তি

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বংরজঃ
সন্নদ্ধং যদপি স্থিতং কুরবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু স্খলিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাং রুতং
শঙ্কে সংহরতি স্মরোঽপি চকিতস্তূণার্ধকৃষ্টং শরম্॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ
অনুবাদ, ৮৬ পৃষ্ঠায় ১২—১৭ পংক্তি

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে
শয্যাপ্রান্ত বিবর্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ।

দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া বিলক্ষশ্চিরম্

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৮৭ পৃষ্ঠায় ৮—১৩ পঙ

ইতঃ প্রত্যাদেশাৎ স্বজনমনুগন্তং ব্যবসিতা
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্ ॥

—শিখরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ৯০ পৃষ্ঠায় ১০—১৫ পঙক্তি

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথানামতটপ্রপাতাঃ ॥

—উপজাতি ছন্দ

অনুবাদ, ৯১ পৃষ্ঠায় ২—৫ পঙক্তি

একৈকমত্র দিবসে দিবসে মদীয়ং
নামাক্ষরং গণয় গচ্ছসি যাবদন্তম্।
তাবৎ প্রিয়ে মদবরোধগৃহপ্রবেশং
নেতা জনস্তবসমীপমুপৈষ্যতীতি ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৯১ পৃষ্ঠায় ২৩—২৬ পঙক্তি

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং
চিত্রার্পিতামহমিমাং বহু মন্যমানঃ।

স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৯৩ পৃষ্ঠায় ২৫—২৮ পঙক্তি

কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণাগৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নিমাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ৯৪ পৃষ্ঠায় ৭—১১

কৃতং ন কর্ণার্পিতবন্ধনং সখে
শিরীষমাগণ্ডবিলম্বিকেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্রমরীচিকোমলং
মৃণালসূত্রং রচিতং স্তনান্তরে ॥

—বংশস্থবিল ছন্দ

অনুবাদ, ৯৪ পৃষ্ঠায় ২০—২২ পঙক্তি

অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্‌ভ্রমর প্রিয়ায়া
ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্ ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ৯৫ পৃষ্ঠায় ১১—১৫ পঙক্তি

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা ॥

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ৯৫ পৃষ্ঠায় ২৩—২৫ পঙক্তি

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি ॥

—শ্লোক ছন্দ

অনুবাদ, ৯৬ পৃষ্ঠায় ২—৩ পঙক্তি

সপ্তম অঙ্ক

বিচ্ছিত্তিশেষৈঃ সুরসুন্দরীণাং বর্ণৈরমী কল্পলতাংশুকেষু।
বিচিন্ত্য গীতক্ষমমর্থজাতং দিবৌকসস্ত্বচ্চরিতং লিখন্তি ॥

—উপজাতি ছন্দ

অনুবাদ, ১০৩ পৃষ্ঠায় ৯—১১ পঙক্তি

অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্ভির্
হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানং বারিগর্ভোদরাণাং
পিশুনয়তি রথস্তে শীকরক্লিন্ননেমিঃ ॥

—মালিনী ছন্দ

অনুবাদ, ১০৩ পৃষ্ঠায় ২৫—২৮ পঙক্তি

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্তানাত্তনুভাবনষ্টসলিলা ব্যক্তিং ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে ॥

—শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ১০৪ পৃষ্ঠায় ৬—১১ পঙক্তি

বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিরুরসা সন্দষ্টসর্পত্বচা
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থং সম্প্রীড়িতঃ।

অংসব্যাপি শকুন্তনীড়নিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ১০৫ পৃষ্ঠায় ৪—৯ পঙক্তি

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চনপদ্মরেণুকপিশে পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলাগৃহেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্যমুনয়স্তস্মিংস্তপশ্যন্ত্যমী ॥

—শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ

অনুবাদ, ১০৫ পৃষ্ঠায় ২১—২৬ পঙক্তি

প্রলোভ্য বস্তুপ্রণয়প্রসারিতো
বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্য পত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া
নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্ ॥

—বংশস্থবিল ছন্দ

অনুবাদ, ১০৭ পৃষ্ঠায় ১৮—২২ পঙক্তি

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি ॥

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ১০৮ পৃষ্ঠায় ২—৬ পঙক্তি

অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রেষু সুখং মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্যাদ্ যস্যায়মঙ্কাৎ কৃতিনঃ প্ররূঢ়ঃ ॥

—উপজাতি ছন্দ

অনুবাদ, ১০৮ পৃষ্ঠায় ২৩—২৫ পঙক্তি

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখীধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি ॥

—মালভারিণী ছন্দ

অনুবাদ, ১১১ পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙক্তি।

স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্।

—আর্যা ছন্দ

অনুবাদ, ১১১ পৃষ্ঠায় ২৪—২৬ পঙক্তি।

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সংমোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া।

—হরিণী ছন্দ

অনুবাদ, ১১২ পৃষ্ঠায় ৮—১২ পঙক্তি।

মোহান্ময়া সুতনু পূর্বমুপেক্ষিতস্তে
যো বাষ্পবিন্দুরধরং পরিবাধমানঃ।
তং তাবদাকুটিলপক্ষ্মবিলগ্নমদ্য
কান্তে প্রমৃজ্য বিগতানুশয়ো ভবামি।

—বসন্ততিলক ছন্দ

অনুবাদ, ১১২ পৃষ্ঠায় ২১—২৫ পঙক্তি।

রথেনানুদ্ঘাতস্তিমিতগতিনা তীর্ণজলধিঃ
পুরা সপ্তদ্বীপাং জয়তি বসুধামপ্রতিরথঃ।

ইহায়ং সত্ত্বানাং প্রসভদমনাৎ সর্বদমনঃ
পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ ॥

—শিখরিণী ছন্দ

· অনুবাদ ১১৫ পৃষ্ঠায় ৯—১৩ পংক্তি।

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাম্ ।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ ॥

রুচিরা ছন্দ

অনুবাদ, ১১৮ পৃষ্ঠায় ১৬—১৮ পংক্তি

টীকা

প্রথম অঙ্ক

প্রস্তাবনা—নটী বিদূষকোবাপি পারিপাশ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে ॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোথৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নটী, বিদূষক কিংবা পারিপাশ্বিক এদের কারো সাথে যেখানে সূত্রধার সংলাপ করেন, নিজেদের ভিতরে উদ্ভূত বিচিত্রকথা, কাজ আর কথাংশের প্রস্তুতি দিয়ে নাটকীয় ঘটনার সুরু পর্যন্ত জানিয়ে দেন তাকে আমুখ কিংবা প্রস্তাবনা বলে।

প্রস্তাবনা, ১৭ পৃষ্ঠায় ১ পংক্তি

নান্দী—আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥

রাজা, দেবতা, ব্রহ্মণ এদের যেখানে আশীর্বাদের সাথে স্তুতি করা হয় তাকে নান্দী বলে।

...অবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে।

বিঘ্নশান্তির জন্যে নান্দী অবশ্য কর্তব্য।

নান্দী, ১৭ পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তি

সূত্রধার—নাটকীয়কথাসূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে।
রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে ॥

রঙ্গমঞ্চে ঢুকে যে প্রথম নাটকীয় কথার সূত্র সুরু করে তাকে সূত্রধার বলে।

সূত্রধার, ১৭ পৃষ্ঠায় ১০ পংক্তি

সূত্র—নাটকীয় বিষয়বস্তু।

সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দী।

সূত্রধার নান্দী পড়েন।—(ভরতের নাট্যশাস্ত্র পঞ্চম অধ্যায়।)

আর্য্যা—বাচ্যো নটীসূত্রধারাবার্য্যনাম্না পরস্পরম্।

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নটী আর সূত্রধার পরস্পর পরস্পরকে আর্য্য আর আর্য্যা বলবে

আর্য্য, ১৭ পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি

নটী—নটের স্ত্রী।

১৭ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

আর্য্যপুত্র—নাট্যোক্তিতে স্ত্রীর স্বামীকে সম্বোধন।

১৭ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

পাটল—পুন্নাগ ফুল কিংবা সেউতি ফুল মতান্তরে গোলাপ ফুল—

—(জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান)

শ্বেত-রক্তস্তু পাটল —অমর কোষ

শ্বেত আর রক্ত মিশ্রিত বর্ণের নাম পাটল।

১৮ পৃষ্ঠায়, ৬ পঙক্তি

আর্য্যমিশ্র—আর্য্যদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ।

গৌরবার্থে সংস্কৃতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়।

১৮ পৃষ্ঠায়, ১৬ পঙক্তি

আয়ুষ্মান্—দীর্ঘায়ুসূচক সম্বোধন।

আয়ুষ্মান্ রথিনং সূতো……।

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নাট্যোক্তিতে সারথি রথীকে আয়ুষ্মান বলে।

১৯ পৃষ্ঠায়, ৪ পঙক্তি

'হরিণকে অনুসরণ করছেন'—শিব যখন তাঁর অনুচরদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ আক্রমণ করেন তখন যজ্ঞ হরিণ হয়ে পালিয়েছিল।

১৯ পৃষ্ঠায়, ৭ পঙক্তি

—হরিৎ আর হরিদের—সূর্য্যের ঘোড়ার নাম।

২০ পৃষ্ঠায়, ৬ পঙক্তি

নেপথ্যে—নেপথ্যে যে কথা শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যোক্তং শ্রুতং তত্র ত্বাকাশবচনং তথা।

—(সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

নাটকে যা বাইরে থেকে বলা হচ্ছে এই ভাবে শোনা যায় তাকে নেপথ্য উক্তি বলে, আকাশবচনও বলে।

২০ পৃষ্ঠায়, ১৪ পঙক্তি

কুলপতি—আশ্রমের প্রধান মুনি, যিনি দশসহস্র শিষ্যকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া স্বগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। —(জ্ঞানেন্দ্রমোহন)

২১ পৃষ্ঠায়, ১১ পঙক্তি

সোমতীর্থ—ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে তীর্থ বিশেষ, প্রভাস ক্ষেত্র।

—(জ্ঞানেন্দ্রমোহন)

২১ পৃষ্ঠায়, ১৮ পঙক্তি

নীবার—তৃণধান্যানি নীবারাঃ —(অমরকোষ)

তৃণধানের নাম নীবার, বাংলায় উড়িধান।

২২ পৃষ্ঠায়, ৫ পঙক্তি

ইঙ্গুদী—একরকম ফল, যা থেকে ঋষিরা তেল বার করতেন।

২২ পৃষ্ঠায়, ৬ পঙক্তি

শমীগাছ—বাংলায় শাঁই গাছ।

...স্যাচ্ছমী সক্তুফলা শিবা —(অমরকোষ)

২৩ পৃষ্ঠায়, ২৩ পঙক্তি

বল্কল—গাছের ছাল। ত্বক্ স্ত্রী বল্কং বল্কলমস্ত্রিয়াং

—(অমরকোষ)

২৪ পৃষ্ঠায়, ৩ পঙক্তি

নবমল্লিকা—সপ্তলা ফুল। সপ্তলা নবমল্লিকা —(অমর কোষ)

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান অনুসারে নেয়ালি ফুল।

২৫ পৃষ্ঠায় ১৫ পঙক্তি

তাতকাশ্যপ—নাট্যোক্তিতে অন্যেরা বৃদ্ধকে তাত বলবে।

কাশ্যপ—কশ্যপের শ্রেষ্ঠ সন্তান। বৃদ্ধস্তাতেতি চেতৈরঃ

—(সাহিত্যদর্পণ)

২৮ পৃষ্ঠায়, ৯ পঙক্তি

আর্য্য—

রাজন্নিত্যৃষিভির্বাচ্যঃ সোঽপত্যপ্রত্যয়েন চ।

স্বেচ্ছয়া নামভির্বিপ্রৈর্বিপ্র আর্য্যেতি চেতরৈঃ ॥

—(সাহিত্যদর্পণ)

ঋষিরা রাজাকে 'রাজন্' বলতে পারেন অপত্য প্রত্যয় করেও বলতে পারেন; ব্রহ্মাণরা নিজের ইচ্ছা হলে ব্রাহ্মাণকে নাম ধরে ডাকবেন। অন্যেরা রাজা কি ব্রাহ্মণকে আর্য্য বলবেন।

২৬ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

...আর্য্যেতি চাগ্রজঃ। —(সাহিত্যদর্পণ)

অগ্রজকে আর্য্য বলা হয়

...অমাত্য আর্য্যেতি চাধমৈঃ। —(সাহিত্যদর্পণ)

অমাত্যকে অধম আর্য্য বলবে।

জনান্তিক—ত্রিপতাককরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথাম্।

অন্যোঽন্যামন্ত্রণং যৎ স্যাজ্জনান্তে তজ্জনান্তিকম্ ॥

ত্রিপতাক কর দিয়ে অন্যদের আড়াল করে একজন আর একজনের সাথে যে কথা বলে তাকে জনান্তিক বলা হয়।

—(সাহিত্যদর্পণ)

২৭ পৃষ্ঠায়, ৫ পঙক্তি

আত্মগত—স্বগত।

অশ্রাব্যং খলু যদ্ বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।

নাট্যোক্তিতে যে কথা অন্যেরা শুনতে পাবে না তাকে স্বগত বলা হয়। —(সাহিত্যদর্পণ)

২৯ পৃষ্ঠায়, ২৪ পঙক্তি

ভগবান—

ভগবন্নিতি বক্তব্যাঃ সর্বৈর্দেবর্ষিলিঙ্গিনঃ।

—(সাহিত্যদর্পণ)

নাট্যোক্তিতে দেবতাদের আর ঋষিদের ভগবান বলা হয়।

২৮ পৃষ্ঠায়, ৩ পঙক্তি

নায়ক এখানে দুষ্মন্ত।

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান।

দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ॥

প্রখ্যাতবংশ, রাজর্ষি, ধীর, উদাত্ত, প্রতাপবান্, গুণবান্, দেবতা কিংবা দেবতা হলেও নিজেকে মানুষ মনে করেন নায়ক এইরকম হবেন। (সাহিত্যদর্পণ)

২৮ পৃষ্ঠায়, ২৭ পঙক্তি

দ্বিতীয় অঙ্ক

যবনী—যবনী বলতে কালিদাস পরসিক মেয়েদের কথাই বলেছেন বলে মনে হয়। রঘুবংশে চতুর্থ সর্গে ৬০/৬১ শ্লোকে কালিদাস যবনী বলতে পারসিক মেয়েদের কথাই বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

৩৩ পৃষ্ঠায়, ১৯ পঙক্তি

সৃষ্টির দ্বিতীয় স্ত্রীরত্ন।

ব্রহ্মা তিল তিল করে সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণ সংগ্রহ করে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তার নাম তিলোত্তমা। তিলোত্তমা সৃষ্টির প্রথম স্ত্রীরত্ন। কবি এখানে শকুন্তলাকে দ্বিতীয় স্ত্রীরত্ন বলছেন।

৩৮ পৃষ্ঠায়, ৯, ১০ পঙক্তি

তৃতীয় অঙ্ক

যজমানশিষ্য—যজ্ঞ করেন এমন শিষ্য।

৪৩ পৃষ্ঠায়, ৩ পঙক্তি

আকাশে—নেপথ্যোক্তি আর আকাশ বচন সমার্থক। টীকা প্রথম অঙ্কে দেখুন।

উশীর—একরকম ঘাস, বাংলায় বেনা ঘাস, তার মূল।

স্যাদ্বীরণ বীরতরং মূলেঽস্যোশীরমস্ত্রিয়াং···

—(অমরকোষ)

৪৫ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

বৈতানিক—যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

৪৩ পৃষ্ঠায়, ১৪ পঙক্তি

ছুটি বিশাখা—ছুটো নক্ষত্র। চাঁদের ছুই স্ত্রী বলে পরিচিত। নাম—বিশখা আর অনুরাধা।

৪৭ পৃষ্ঠায়, ১৯ পঙক্তি

চতুর্থ অঙ্ক

বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥

—(সাহিত্যদর্পণ)

অতীতের সূত্র নিয়ে ভবিষ্যতের আভাষ দিয়ে অঙ্কের প্রথমে যা দেখান হয় তাকে বিষ্কম্ভক বলে।

৫৬ পৃষ্ঠায় ১৮ পঙক্তি

প্রিয়ংবদা···সংস্কৃতে—

সংস্কৃত নাট্যোক্তিতে কে কি ভাষায় কথা বলবে সে সম্বন্ধে একটা রীতি ছিল। সেই রীতি অনুসারে প্রিয়ংবদা শৌরসেনীতেই কথা বলেছেন, সাহিত্যদর্পণে আছে—

···পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎকৃতাত্মনাম্॥
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্।

অর্থাৎ যে সমস্ত পুরুষরা নীচু নন তাঁরা সংস্কৃত বলবেন আর সেই রকম মেয়েরা শৌরসেনী বলবেন।

কিন্তু এই রকম মেয়েদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্কৃত বলারও রীতি ছিল। সাহিত্যদর্পণকার বলছেন—

যোষিৎসখীবালবেশ্যা-কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা॥

অর্থাৎ—

স্ত্রীলোক, সখী, বালক, বেশ্যা, দ্যূতকর আর অপ্সরা এরা বৈচিত্র্যের জন্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃত বলবেন। মূল বইএ এখানে প্রিয়ংবদা সংস্কৃতে কথা বলেছেন।

৫৮ পৃষ্ঠায়, ২২ পঙক্তি

ক্ষীরবৃক্ষ—ডুমুর গাছ কিংবা অশ্বত্থ গাছ।

—(জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান)

৬৪ পৃষ্ঠায়, ১৯ পঙক্তি

পঞ্চম অঙ্ক

কঞ্চুকী—

অন্তঃপুরচরোবৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।

সর্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥

সব কাজে কুশল যে গুণবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরে যাতায়াত করেন তাকে কঞ্চুকী বলে।

৬৯ পৃষ্ঠায়, ৮ম পঙক্তি

ছ'ভাগের একভাগ যাদের বৃত্তি—

—সর্বতো ধর্মষড়্‌ভাগো রাজ্ঞোভবতি রক্ষতঃ—ধর্ম অনুসারে রক্ষা করেন বলে রাজা ছ'ভাগের এক ভাগ পেয়ে থাকেন —মনু।

৬৯ পৃষ্ঠায় ২০ পঙক্তি

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রবেশক—

প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।

অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা ॥

—(সাহিত্য দর্পণ)

প্রবেশক বিষ্কম্ভকের মত। তবে নীচপাত্র প্রাকৃত ভাষায় দুটো অঙ্কের মাঝখানে প্রবেশক উপস্থিত করে।

৮২ পৃষ্ঠায়, ২য় পঙক্তি

পণ্ডিতমশাইরা—মূলে ভাবমিশ্রাঃ

…ভাবোবিদ্বান্…

—(অমরকোষ)

নাট্যোক্তিতে পণ্ডিতের নাম ভাব।

৮৩ পৃষ্ঠায়, ১ম পঙক্তি

বোনাই—(মূলে আবুত্ত)

ভগিনীপতিরাবুত্তো…

—(অমর কোষ)

নাট্যোক্তিতে ভগ্নিপতির নাম আবুত্ত

৮৩ পৃষ্ঠায়, ১৩ পঙক্তি

কাদম্বরী—মদের নাম।

…গন্ধোত্তমা প্রসন্নেরা কাদম্বর্য্যঃ পরিস্রুতা

—(অমর কোষ)

৮৪ পৃষ্ঠায়, ২২ পঙক্তি

তিরস্করণী বিদ্যা—

যে বিদ্যা দ্বারা অদৃশ্য হওয়া যায়।

—(চলন্তিকা)

৮৫ পৃষ্ঠায়, ৭ম পঙক্তি

ভট্টিনী—

…দেবীকৃতাভিষেকায়ামিতরাসু চ ভট্টিনী

—(অমর কোষ)

নাট্যোক্তিতে রাজার যে রাণীর অভিষেক হয়েছে তিনি দেবী—অন্যেরা ভট্টিনী।

৯২ পৃষ্ঠায়, ২১ পঙক্তি

উদ্‌ভ্রান্তক ভঙ্গী—

পূর্বং দক্ষিণমুখাস্য পশ্চাৎ আকুঞ্চয়ন্ পদম্।

বামং শীঘ্রং বামাবর্ত্তকমুদ্‌ভ্রান্তকম্ বিদুঃ॥

—(সঙ্গীত সুধানিধি)

প্রথমে ডানপা তুলে পরে কুঁচকে বাঁ পাকে তাড়াতাড়ি বাঁদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নেয়াকে উদ্‌ভ্রান্তক বলে জানবে।

৯৯ পৃষ্ঠায়, ৩য় পঙক্তি

সপ্তম অঙ্ক

মন্দার—স্বর্গের গাছ।

পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ…। —(অমরকোষ)

পাঁচটি দেবতরুর নাম—

মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন।

হরিচন্দন—একরকম চন্দন—

তৈলপর্ণিকগোশীর্ষ হরিচন্দনমস্ত্রিয়াম্.

—(অমরকোষ)

১০২ পৃষ্ঠায়, ১৬ পঙক্তি

হরির দ্বিতীয় পা—

এখানে কবি বামনাবতারের কাহিনী সম্বন্ধে বলছেন। বিষ্ণু বামন হয়ে এসে বলিরাজার কাছে ত্রিপাদভূমি ভিক্ষে চেয়েছিলেন। দানবীর বলি সামান্য বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান। তখন ভগবান বিষ্ণু একপা ফেললেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আর দ্বিতীয় পা ফেললেন সমস্ত আকাশ জুড়ে। তৃতীয় পা ফেলার আর কোন স্থান রইল না। শেষে বামন বলির মাথায় তৃতীয় পা রেখে তাঁকে পাতালে পাঠিয়ে দেন।

ভদ্রমুখ—সৌম্য

সৌম্যভদ্রমুখেত্যেবমধমৈস্তু কুমারকঃ ॥ —(সাহিত্যদর্পণ)

নাট্যোক্তিতে অধমরা রাজকুমারকে ভদ্রমুখ কিংবা সৌম্য বলবেন।

১০৩ পৃষ্ঠায়, ১৬ পঙক্তি

পৌলমী—ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম।

…পুলোমজা শচীন্দ্রাণী —(অমরকোষ)

১১৪ পৃষ্ঠায়, ১৪ পঙক্তি

ভরতবাক্য—প্রধান নটের সামাজিকদের নাটক পরিসমাপ্তি কালে আশীর্বাণী।

১১৮ পৃষ্ঠায়, ১৫ পঙক্তি

চিত্র-পরিচিতি

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

১। ভিটাতে পাওয়া গোল মৃৎফলক।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরীপ—১৯১১-১২ সালের কার্যবিবরণী। স্যার জন মার্শাল। 'ভিটাতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন' পৃষ্ঠা ৩৫।

"এই বাড়ীর স্তরভেদের সঙ্গে নাগার্জুনের বাড়ীর স্তরভেদের যথাযথ মিল রয়েছে, আর এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, দুটি প্রায় একই সময় তৈরী হয়েছে, ভেঙে পড়েছে আবার তৈরী হয়েছে। ২৪ নম্বর ছবিতে ছাপা সুন্দর গোল পোড়ামাটির ফলকটি ঘরের ভিৎ থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই গোলাকার ফলকের দুদিকেই যে দৃশ্য রয়েছে সাঁচী অর্ধচিত্রের সঙ্গে তার মিল সব বিষয়েই, কিন্তু যে ছবি থেকে এই অর্ধচিত্রের ছাপ নেয়া হয়েছে তার শিল্পনৈপুণ্য পাথর কিংবা মর্মরের যে কোন শিল্পনৈপুণ্যের চাইতে অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, ছাঁচটি হাতীর দাঁতেই তৈরী হওয়া সম্ভব। ভিটাতে তৈরী কয়েকটি ফলকের ছাঁচই এতে তৈরী। এ অনুমান সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক আমার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সে সময় উজ্জয়িনীর হস্তীদন্ত শিল্পীরা যে ধরনের শিল্পদ্রব্য করছিলেন এটা ঠিক সেই ধরনেরই শিল্পকর্ম। আমরা জানি, তাঁরাই সাঁচীর চিত্রকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই গোলফলকে উৎকীর্ণ দৃশ্যের সঙ্গে ডাঃ ভোগেল কালিদাসের একটি বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার একটি দৃশ্যের তুলনা করেছেন। তাতে রাজা দুষ্মন্ত আর তার সারথিকে কণ্বের আশ্রমে আশ্রয় নেয়া হরিণকে হত্যা না করতে অনুরোধ করা হয়েছে।"

চিত্র-সম্পাদকের মত—বিভিন্ন মূর্তির বিন্যাস আর রচনাই, এই ফলকটিতে যে শকুন্তলার একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা প্রমাণ

করে। আশ্রমের সীমানার বেড়া দিয়ে ঘেরা উপরের অংশে দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। রাজবেশে একটি পুরুষ হাতে কি একটা জিনিস নিয়ে আর একটি স্ত্রীলোক। দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে। রাজার আশ্বাস দেবার ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই মনে হয়, এটা আশ্রমের এলাকার বাইরে দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার বিদায়ের দৃশ্য। নিচে ডান দিকে একটি চার ঘোড়ার রথে রাজা আর সারথি; রথের যাবার পথ আটকে একজন তপস্বী অনুরোধ করছে। বেড়া দিয়ে ঘেরা কুঁড়ে ঘরের সামনে পুষ্পিত গাছের নিচে ফুল হাতে মেয়েটির আবেগভরা ভঙ্গী আর রাজার বিস্মিতদৃষ্টি খুবই অর্থপূর্ণ। এটা দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার প্রথম দর্শন হতে পারে। নিচে, সবচাইতে নিচের সীমানার কাছে পদ্মসরোবরে একজন তপস্বী স্নান করছে কিংবা জল নিচ্ছে। একজোড়া হরিণ আর পেখমতোলা একটা ময়ূর আশ্রমের স্বাভাবিক চরিত্র ফুটিয়ে তুলছে।

১। মহাস্থানে পাওয়া ভাঙা মৃৎফলক।

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরীপ—১৯২৮-২৯ সালের বার্ষিক কার্যবিবরণী, অনুসন্ধান বাংলা পৃষ্ঠা—৯৬।

"মহাস্থানের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক জিনিস-পত্রের সংখ্যা ৬৬৫। অনুসন্ধান এলাকার বিস্তৃতি বিচার করলে এই সংখ্যা খুবই কম। এই মরসুমের সবচাইতে ভাল প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিস একটা মৃৎপাত্রের টুকরো। তাতে অনুন্নত ভাবে উৎকীর্ণ একটা দৃশ্যে চার ঘোড়ায় টানা রথে চড়া একটি লোককে একপাল হরিণ আর একটি কিন্নরের দিকে তীর ছুঁড়তে দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রার্ধ দেখে ভিটা থেকে পাওয়া বিখ্যাত পোড়ামাটির ফলকের কথা মনে পড়ে আর এটা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম দিককার হবে।"

চিত্র-সম্পাদকের মত—উপরের বিবরণ পড়লে ভাঙা পোড়া মাটির ফলকটিতে রূপায়িত শিকারের দৃশ্যের সঙ্গে শকুন্তলার কোন সম্পর্ক আছে কি নেই তা অনিশ্চিত অনুমানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ভারতীয় আশ্রমে একটি গ্রীক কিন্নরের

দেহের উপরের অর্ধেক মানুষের আর নিচের অর্ধেক ঘোড়ার উপস্থিতি সত্যিই দুর্বোধ্য। কিন্তু ফলকটির উপরের অংশ একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে, মূর্তিটি মোটেই কিন্নর মূর্তি নয়। একটি জন্তুর বদলে আমরা স্পষ্ট দুটি জীব দেখতে পাই। প্রথমটি পলায়মান হরিণ আর দ্বিতীয়টি হরিণটির মাথার ঠিক উপরে একটি মানুষের মূর্তি। মানুষের মূর্তিটি দুটো হাত বাড়িয়ে বিপদগ্রস্ত হরিণটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে কিংবা শিকারী রাজাকে হরিণ শিকার করতে নিষেধ করছে। সেই জন্যে এই দৃশ্যকে শকুন্তলার একটি দৃশ্য বলে মনে করা সহজ আর স্বাভাবিক বলে মনে হয়। উত্তর বঙ্গের এই ফলকটি শুঙ্গযুগের শিল্পকর্মের একটি শ্রেষ্ঠনিদর্শন এতে শিল্পী চূড়ান্ত নৈপুণ্যের সাথে এঁকেছেন, একদল হরিণ প্রাণের ভয়ে দৌড়চ্ছে, আর চলার ছন্দে সাজানো ধাবমান চারটি তেজিয়ান ঘোড়ায় টানা রথের সামনে পা দিয়ে উত্তেজিত দুষ্মন্ত তীর ছুঁড়তে যাচ্ছে। আর আছে উপরের সীমার কাছে তাপসীর আবেগপূর্ণ ছবি।

হিন্দী পুঁথি

"১৭৮৯ সালের 'শকুন্তলার' একটি সচিত্র হিন্দী পুঁথি।" লেখক আদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়; ললিতকলা সংখ্যা ১-২; এপ্রিল ১৯৫৫—মার্চ—১৯৫৬; পৃষ্ঠা ৪৬-৫৪।

এই পুঁথিতে ৪৯ পাতা আর একুশটি ৭½" × ৪¾" ছবি আছে। পুঁথিটি প্রথমে ছিল নাগপুরের রাজা প্রতাপ সিং ভোঁসলের কাছে। ছবির জন্যে এই পুঁথির আকর্ষণ অদ্ভুত, এটা নিওয়াজা নামে একজন কবির লেখা শকুন্তলার হিন্দী পাঠ। লণ্ডনে ভারত ও পাকিস্থানের শিল্পকলা প্রদর্শনীতে এটা প্রদর্শিত হয়েছিল, সেখানে একে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের রাজস্থানী শিল্প বলে বলা হয়েছিল; কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় এর তারিখ দেয়া আছে :—

"মাঘ মাসে, শুক্লপক্ষে, তিথি পূর্ণিমায়াম্, সম্বৎ ১৮৪৫ অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ।

পুঁথির প্রত্যেক পৃষ্ঠার মাপ ৯½" × ৫¾"। তার ভিতরে ৭½" × ৪½" চতুষ্কোণ এলাকা পাড় দিয়ে ঘিরে লেখার জায়গা। ছোট ছবিগুলোর রচনা, শিল্পশৈলী, পোষাক, আসবাব, অলঙ্করণ, জীবজন্তু, পরিজন এ সবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে রাজস্থানী আর দক্ষিণী শিল্পশৈলীর মিশ্রণে সৃষ্ট এ এক নতুন শিল্পশৈলী।

ইউরোপ আর জার্মানিতে কালিদাস

(জার্মান পণ্ডিত ওয়াল্‌টার রুবেনএর প্রবন্ধের জোয়ান বেকারের ইংরেজী অনুবাদের সচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ)

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে ইউরোপে পরিচিত হন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেশীয় রাজন্য আর ফরাসীদের সাথে যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে এলাকা দখল করে, এই সময় ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসকরা সেই এলাকায় একটি কেন্দ্রীয় শুল্ক, আইন আর শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই এলাকা সারা ভারতের অর্ধেকেরও বেশী আর সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই ছিলেন ইংরেজ।

১৭৮৩ সালে শিক্ষিত ধনিকশ্রেণীর সংস্কৃতিবান এক ভদ্রলোক স্যার উইলিয়াম জোন্স বঙ্গদেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। ১৭৮৯ সালে, অর্থাৎ যে বছর ফরাসী বিপ্লব হয় সেই বছর স্যার উইলিয়াম কালিদাসের নাটক শকুন্তলার একটি ইংরাজী গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন। এইভাবে তিনি বিস্মিত ইউরোপকে দেখান যে, প্রাচীন ভারত নাটক আর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় জানত। তিনি কালিদাসকে ভারতীয় সেক্‌সপীয়ার নাম দিয়েছিলেন। তুলনাটা অবিশ্যি খুব ভাল হয়নি।

১৭৯১ সালে অর্থাৎ যে বছর বিপ্লবী গণতন্ত্রী জ্যাকোবিনরা বড় বড় জমিদার আর ধনিকদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে তাদের বিপ্লব বিস্তার করছিল সেই বছর জর্জ ফর্স্টার জোন্সের শকুন্তলার জার্মান গদ্য অনুবাদ প্রকাশ করেন।

একখানা অনুবাদ তিনি গ্যেটেকে পাঠিয়ে দেন। এই অনুবাদ পড়ে তিনি এত খুশি হয়ে ওঠেন যে তিনি শকুন্তলার প্রশংসায় বিখ্যাত কবিতাটি লিখেন। কবিতাটি অন্যত্র উদ্ধৃত হল।

কবিতাটি গ্যেটে ১৭৯১ সালে "জার্মান মাসিক পত্রিকায়" প্রকাশ করেন। পরের বছর হার্ডার ভাইমারে ছিলেন। সেই বছর এই কবিতাটি তাঁর "প্রাচ্যনাট্য সম্বন্ধে" প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত করেন। ১৭৯৮ সালে তিনি আবার শকুন্তলা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন "সেদেশের (ভারতের) পূর্ণ বিকশিত সংস্কৃতির একমাত্র উদাহরণ 'শকুন্তলা'। সেই জন্যে লোকে অনেক্ষণ ধরে এর আনন্দ উপভোগ করে। নিকট ভবিষ্যতে আমরা আরও শকুন্তলা পাব নিশ্চয়ই, কারণ তারাই নানা-জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।"

মাত্র পাঁচ বছর পরে ১৮০৩ সালে হার্ডার ফর্স্টারের অনুবাদ আবার প্রকাশ করেন। এতে ছোট একটা উৎসর্গপত্র তিনি কালিদাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রকাশ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাইপ্‌জিগ্‌ মেলায় ফ্রিড্‌রিশ শ্লেগেল ফর্স্টারের প্রথম সংস্করণের সাথে পরিচিত হন। তিনি তাঁর ভাইয়ের কাছে চিঠিতে এই উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা লেখেন। পরে তিনি প্যারীতে সংস্কৃত পড়তে যান। তারপর তিনি জার্মানীতে ভারততত্ত্বের আলোচনা প্রবর্তন করেন।

পরে গ্যেটে লিখেছিলেন "শকুন্তলার এই অনুবাদকে আমরা জার্মানরা যে উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিলাম তা মনে করলে বলতে হয় এ অনুবাদ আমাদের যে আনন্দ দিয়েছিল তার কৃতিত্ব যে গদ্যে এ অনুবাদ হয়েছিল সেই গদ্যেরই।"

ফর্স্টারের বই জার্মান মধ্যবিত্তশ্রেণীকে প্রচুর প্রভাবিত

করেছিল। ১৮৫৫ সালে ফ্রিড্রিশ রুকার্ট আবার এই নাটকটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন—তবে এবার সংস্কৃত থেকে। এই অনুবাদ কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর।

হাইনরিখ হাইনের মৃত্যুর পর তার রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ায় অনেকেই বুঝতে পারলেন যে, হাইন জার্মান নাটকের একটি মূল্যবান দিক লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর "চিন্তা আর ধারণা" নামে অধ্যায়ে তিনি লেখেন "ফাউস্ট-এর প্রথম দিকে গ্যেটে শকুন্তলার সাহায্য গ্রহণ করেছেন" এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ফাউষ্টের প্রথম অংশ পরিকল্পনায় গ্যেটে শকুন্তলার প্রস্তাবনার সাহায্য নিয়েছেন। ভারতীয় নাট্য দিন-রাত্রির কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই রকম ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাথে জড়িত। শকুন্তলার প্রথমে একজন অভিনেতা এসে শিবের কাছে একটি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। তারপর সূত্রধার এসে নটীকে ডেকে বলেন বিদগ্ধবহুল দর্শকদের সামনে কালিদাসের শকুন্তলা অভিনীত হবে। সুতরাং প্রত্যেকটি অভিনেতাই যেন যতটা সম্ভব চেষ্টা করেন।

তখন সূত্রধার বলেন "বিদগ্ধসমাজ খুশী না হওয়া পর্যন্ত প্রযোজনাকে ভাল বলতে পারছি না। আমি অনেক পরিশ্রম করেছি কিন্তু নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে। সূত্রধার তারপর নটীকে আধুনিক গ্রীষ্মকাল নিয়ে একটা গান করতে বলেন। তারপর নাটক সুরু হয়।

গ্যেটের প্রস্তাবনা এই রকম। প্রযোজক নাটকের কবি আর বিদূষককে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে আসেন। তিনি একটু ঘাবড়ে গিয়েছেন, কারণ দর্শকরা বড় বেশী পণ্ডিত। কবি প্রথমে জনতার কথা শুনতেই চান না, তিনি ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের কথা ভাবতে রাজী। বিদূষক ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের কথা ভাবতে একটুও রাজী নন, তিনি খালি সমসাময়িক লোকদের কথা ভাববেন। প্রযোজক অভিনয়টি ভাল করে করতে চান।

বিদূষক কবিকে উপদেশ দেন "জীবনের পূর্ণতার মাঝে ঝাঁপ দাও। জীবন ভোগ করে সবাই কিন্তু সে কথা উপলব্ধি করে অল্প লোকেই। জীবনের যেখানে হাত দেবে সেই তোমার মনকে টানবে।"

কবি সত্যের আকর্ষণ আর প্রতারণার আনন্দের কথা বলেন। এই ভাবে শিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে তিন জনে বেশ রসিকের মত আলোচনা করেন।

কালিদাস কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে তাঁর ছোট্ট প্রস্তাবনায় দর্শকদের নাটক আর নাট্যকারের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তখন নাটকের নির্ঘণ্টপত্র কিছু ছিল না। এই সুযোগে তিনি সভাপূজোও করেছেন। তাঁর দর্শকরা গ্যেটের ভাইমারের মত রাতের পর রাত আনন্দের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন না। কালিদাসের দর্শকদের ভিতরে ছিলেন কিছু ভদ্রলোক, অভিজ্ঞ শ্রেণীর কিছু লোক, কয়েকজন ব্রাহ্মণ, কিছু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আর হয়ত কিছু ধনী বণিক। তাঁরা হয়ত কোন উৎসবের দিন জড় হতেন ছোটখাট কোন নাট্যশালায় কি রাজবাড়ীর কোন বড় ঘরে। সেখানে তাঁদের মনোরঞ্জন করা হত। জনসাধারণের অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝতে পারতেন না। সুতরাং এঁদের সমাজ ছিল আলাদা, সে সমাজের নাট্যশালার কাছে প্রত্যাশা আলাদা, ফলে দুজনের প্রস্তাবনা দুরকম। তবুও গ্যেটের শিল্পের এই রত্নের জন্যে আমরা এই ভারতীয় কবির কাছে ঋণী।

শ্রী উইলসনের অনুবাদের ভিতর দিয়ে কালিদাসের গীতিকবিতা মেঘদূতের সাথেও গ্যেটের পরিচয় ছিল। ১৮২১ সালে উইলসন সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮১৩ সালে তিনি কলকাতায় তাঁর প্রথম বই মেঘদূতের মূল আর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই কবিতায় নির্বাসিত যক্ষ দেশে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছে মেঘের মুখে। এর উপরে গ্যেটে তাঁর একটি ছোট্ট কবিতা লিখেছিলেন।

"শকুন্তলা, নল, এদের মানুষ ভালবাসবেই।
মানুষ এর চাইতে মধুর আর কি আশা করতে পারে?
আর মেঘদূত।
কে না তাকে পাঠাবে প্রাণের বোনের কাছে?"

তাঁর "প্রাচ্যপাশ্চাত্য কবিতা সংগ্রহ সম্পর্কে" লেখায় তিনি স্বীকার করেছেন "এই ধরনের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় সবসময়ই জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা।" কিন্তু তিনি উইলসনের অনুবাদ একটু বেশী কোমল বলে সমালোচনা করেছেন। উনসেরেন কোসগার্টেনের মূল থেকে অনুবাদ করা কয়েকটি শ্লোকের তিনি প্রশংসা করেছেন। বলেছেন "তা থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম ধারণা হয়।" ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে উইলহেম ভন হুমবোল্ট, দক্ষিণ থেকে যখন প্রথম মেঘ আসে সেই প্রথম বর্ষার বর্ণনার জন্যে প্রাচীন ভারতের এই কবিতার প্রশংসা করেন।

বিয়েলফেল্ডএ ১৮৫৯ সালে সি, সুয়েজ প্রথম পদ্য অনুবাদ প্রকাশ করার পরে আরও কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ছন্দেও কয়েকটি অনুবাদ হয়।

১৮২৭ সালে উইলসনের "বিক্রমোর্বশীর" ইংরাজী অনুবাদ আর "মালবিকাগ্নিমিত্রের" ইংরাজী সংক্ষিপ্তসার ইউরোপে প্রচারিত হয়। শিক্ষিত জার্মানরা মালবিকাগ্নিমিত্রের স্বাদ প্রথম পান এ ওয়েবারের চমৎকার অনুবাদের মাধ্যমে। বার্লিনের এই বিরাট ভারততত্ত্ববিদ্ একে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত উইলসনের সময় থেকে পণ্ডিতরা এই নাটকের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতেন। লাইয়ন ফুখটওয়াঙ্গারের মত লোক "রাজা আর নর্তকী" নাম দিয়ে এই নাটককে ১৯১৭ সালে জার্মান রঙ্গমঞ্চের জন্যে প্রস্তুত করেন।

১৮১৪ সালে বোলেনসেন বিক্রমোর্বশীর জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৩৪ সালে রুকার্ট তাঁর সংক্ষিপ্তসারে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করেন। কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যের অজবিলাপ অংশের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ ১৮৩৩ সালে করেছিলেন। এ, এফ ভনশাকের করা এই বইয়ের একটি স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদ ১৮৯০ সালে প্রকাশিত ভনশাকের হয়। ও, ওয়ালটারের গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে।

কালিদাসের ষষ্ঠ বই কুমারসম্ভব একটি মহাকাব্য। গ্রিফিথ

"এই নাটকটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমি এক অপূর্ব কাব্যরসের আস্বাদ পাইয়াছি। ইহার প্রতিটি ছত্রে রহিয়াছে সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ, বসন্ত-সন্ধ্যার প্রশান্তির ন্যায় কোমল এক মাধুর্যের স্পর্শ, প্রকৃতির সরল পরিত্রতা আর আশ্চর্য রচনাদক্ষতা। ইহাকে প্রাচীন ভারতের এক স্নিগ্ধসুন্দর চিত্র বলা যাইতে পারে—ঠিক যেমন হোমারের কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে প্রাচীন গ্রাস—টুকরা টুকরা ছবির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তৎকালীন মানুষের চরিত্র, রীতিনীতি, আচার-বিচার। আমার মনে হয়, কালিদাস হোমারের সমপর্যায়ের মহাকবি।"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই রাশিয়ায় কালিদাসের প্রায় সমস্ত রচনার পূর্ণাঙ্গ রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, সংস্কৃতজ্ঞ রুশ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই কালিদাসের সমকালীন ভারতের ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে এবং তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ করিয়া গবেষণা-অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মিনায়েফ, ওল্‌দেনবুর্গ, আদেলুং, শেচরবাৎস্কি, বারান্নিকফ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

কালিদাসের জীবনী সম্পর্কে যেমন বিশেষ কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, তেমনি তাঁহার রচনাবলীর মধ্যেও কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত রচনা ঢুকিয়া গিয়াছে। যেমন, ভারতীয় ও বৈদেশিক পণ্ডিতদের একটা খুব বড়ো অংশ মনে করেন, তিনটি দৃশ্যকাব্য (অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশী) এবং তিনটি শ্রুতিকাব্য, (কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ)—এই ছয়টি পূর্ণাঙ্গ রচনাই মূলতঃ কালিদাসের। নলোদয় বা অন্যান্য দু'একটি রচনার মধ্যে কতটুকু কালিদাসের হাতের স্পর্শ আছে বা এগুলি আদৌ কালিদাসের কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শৃঙ্গারকাব্যগুলি কালিদাসের নামে প্রচলিত থাকিলেও, এগুলি যে কালিদাসের রচনা হইতে পারে না তাহা সর্ববাদীসম্মত।—সোবিয়েৎ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরাও এই মতেরই পরিপোষক।

কালিদাসের কাল লইয়াও অনুরূপ মতভেদ আছে। ভারতীয়

পণ্ডিতদের মধ্যে নানা জনে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে নানা সময়ে কালিদাসের কাল নির্ধারণ করিয়াছেন তবে কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন—এই মতের সমর্থকরাই অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ। সোবিয়েৎ পণ্ডিতরাও মোটামুটি এই মতই সমর্থন করেন।

কালিদাসের রচনাবলী যেমন চিরন্তন এক আনন্দরসের উৎস, তেমনি তাঁহাকে লইয়া গবেষণা-অনুশীলনেরও শেষ নাই। সোবিয়েৎ দেশে কালিদাসের কাব্য যেমন ব্যাপক ভাবে পঠিত হয়, তেমনি প্রবীণ ও তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ সোবিয়েৎ ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ কালিদাস সম্বন্ধে গবেষণা-অনুসন্ধানের কাজে সাহিত্যালোচনার কাজে ছেদ পড়িতে দেন নাই। সম্প্রতি এ কাজে ভারতীয় সহযোগী গবেষক-সমালোচকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা পাইবার ফলে তাঁহাদের কাজ সহজতর হইয়াছে।

এই বৎসরে ১৯৫৮ সালে সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে কালিদাস সম্পর্কে ভি. আই. কালিয়ানফ ও ভি. জি. এরমান লিখিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কালিদাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি রচনার কাহিনী বলা হইয়াছে, অংশ বিশেষের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং তৎকালীন ভারতের ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিকায় এই রচনাগুলির বিস্তৃত টীকা-ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করা হইয়াছে।

চীনদেশে শকুন্তলা

উ শুয়ে

('ভারত-চীন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'উ শুয়ে'র প্রবন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুসরণ।)

১৯২৫ সালে চীনের বিখ্যাত মঞ্চ পরিচালক চিয়া-ও-চু-ইন ভারতের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার কলিদাসের 'শকুন্তলার' চীনা

অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভাষান্তরিত নাটকটির নামকরণ হয় 'তারাপো আংটি'। তারপর ইংরাজী, ফরাসী আর জার্মান ভাষা থেকে শকুন্তলার চীনা অনুবাদ খুব কম করেও আটটি বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই অনুবাদগুলির ভিতরে মিলের চাইতে গরমিলই ছিল বেশি। সেই জন্যে কোন অনুবাদই যথাযথ হয়ে ওঠেনি।

১৯৫৬ সালে সারা চীনে বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের স্মরণে জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। পিকিঙ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ চিসিয়েন লিন এই উৎসব উপলক্ষে মূল সংস্কৃত থেকে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার চীনা অনুবাদ করেন।

আশ্চর্য ভঙ্গি আর অপূর্ব রচনাশৈলী এই নাটকটিকে চীনে এত জনপ্রিয় করে তোলার কারণ। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'শকুন্তলা' ভাব গভীরতার সম্পদে আর কল্পনার সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠতম, তাছাড়া এতে সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মানব চরিত্রের গভীর উপলব্ধি। সুঙ্ ও য়্যুয়ান যুগের নান্‌শি বা চীনের পূর্বাঞ্চলীয় নাটকের সঙ্গে ভারতীয় প্রথাগত নাটকের সাদৃশ্য প্রচুর।

১৯৫৮ সালে পিকিঙে শকুন্তলা নাটক চীনা ভাষায় অভিনীত হয়। এই অভিনয় চলে বার দিন ধরে। অভিনয় খুবই সফল আর জনপ্রিয় হয়। ১২ দিনের প্রবেশপত্র প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টার ভিতরে বিক্রি হয়ে যায়।

ভারত ও চীনের জনসাধারণের ভিতরে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক আর সাংস্কৃতিক মিল অনেক, তাছাড়া ভারত ও চীনের মেয়েরা প্রায় একই ধরনের ঐতিহ্যের ছায়ায় পালিত। ভারতীয় মেয়েদের প্রথাগত শিষ্টাচার ঐতিহ্যাশ্রয়ী, শকুন্তলা সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিভূ। শকুন্তলা যেমন শান্ত, নম্রস্বভাব ও সুন্দরী, তেমনি তার ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু চীনের কাছে এই চরিত্র একেবারে অপরিচিত নয়।

শকুন্তলা অভিনয়ের সাফল্যের কারণ হয়ত এগুলোও।